বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ

মোঃ আবদুল মোহাইমেন

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ

প্রথম খণ্ড

মো: আবদুল মোহাইমেন, প্রাক্তন সংসদ সদস্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রচনা

প্রথম প্রকাশ ঃ
বৈশাখ, ১৩৯১
(মে, ১৯৮৪)

লেখক ও প্রকাশক ঃ
মোঃ আবদুল মোহাইমেন

পরিবেশক ঃ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭নং জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১

মূল্য ঃ বার টাকা।

মুদ্রণে ঃ
দি ওরিয়েন্ট প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিশিং ওয়ার্কস
৩/৫, জনসন রোড, ঢাকা-১।

BANGLADESHER RAJNITITE AWAMI LEAGUE and Other Essays By Md. Abdul Mohaimen. Copy right for Md. Abdul Mohaimen; Published by Md. Abdul Mohaimen. Tk. 12/00

www.pathagar.com

ভূমিকা

'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ' প্রবন্ধটি কেন লিখলাম এ সম্পর্কে পাঠকের কাছে একটা বক্তব্য রাখা আমি প্রয়োজন বোধ করি। ১৯৪৯ সন থেকে আমি আওয়ামী লীগের একজন সদস্য ও ১৯৭০ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত পাইওনিয়ার প্রেসের মালিক হিসেবে প্রচার পুস্তিকা মুদ্রন, পোস্টার ছাপা, বিশেষ করে ছয় দফার লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা মুদ্রনের মারফৎ আওয়ামী লীগ ও দেশের জন্য আমি প্রচুর অর্থব্যয় করি। এই ব্যয়ের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এদেশের মানুষের স্বাধীকার অর্জ্জিত হবে, দেশের অর্থনীতির উপর সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, জীবন হবে সুন্দর ও অর্থবহ। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এ দেশে যা যা ঘটতে আরম্ভ করল তাতে ধীরে ধীরে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। গত তিন দশক ধরে প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন বিশেষ করে ছয় দফা অন্দোলনের জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছি তার যথার্থতা সম্পর্কেই আজ মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

চোখের সামনে দেখলাম কতকগুলি অবাস্তব ও ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল তার থেকে জনসাধারণ ক্রমে সরে যাচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। মনটা দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। যখনই সুযোগ পেয়েছি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী উপরের নেতাদের কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছি, পার্টির নীতিকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছি কিন্তু বিশেষ সফল হইনি। তার কারণ কখনও সক্রিয় রাজনীতি করতাম না বলে আওয়ামী লীগের সংগঠনের কোন কর্মকর্তার পদে আমি অধিষ্ঠিত ছিলাম না। ফলে পার্টির নীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তারের আমার কোন সুযোগ ছিলনা। বঙ্গবন্ধু আমাকে খুব ভালবাসতেন এবং আওয়ামী লীগে আমার নিঃস্বার্থ সেবার জন্য সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু তিনি

www.pathagar.com

সর্বদা এত ব্যস্ত থাকতেন যে তার সঙ্গে একলা আলাপ করার সুযোগই হতোনা। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, তাঁর জনপ্রিয়তা কমে যাচ্ছে, তাঁর আরও সতর্ক হওয়া উচিৎ এসব কথা তিনি বিশেষ সন্তুষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করতেন না। সব ঠিক আছে, সব কিছু ঠিক মত চলছে এসব কথা যারা বলত তাদের কথাই তিনি যেন অধিক বিশ্বাস করতেন।

অবস্থা এরূপ দেখে রাজনীতির প্রথম কাতার ছেড়ে তৃতীয় কাতারে সরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম সাধারণ মানুষ থেকে আওয়ামী লীগ ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হতে হতে ১৫ই আগষ্ট '৭৫ সনে বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা থেকে কি ভাবে অপসারিত হলো। দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে প্রত্যক্ষ করলাম আওয়ামী লীগের মধ্যে ক্ষমতার জন্য ভিতরে ভিতরে চলেছে কি অস্বাভাবিক কোন্দল। দেখলাম যে তাজুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে '৭১ সনের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, যাকে মুজিবনগরে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৬ ঘন্টা পরিশ্রম করতে দেখেছি, আওয়ামী লীগের স্বার্থবাদী মহলেরা তাকেই চট্টগ্রামের কুখ্যাত চোরাকারবারী ম্যান সেরুমিয়া বলে জনসাধারণের কাছে চিহ্নিত করার ঘৃণিত অপচেষ্টা করেছে। এ সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে লোক চক্ষে আওয়ামী লীগের হেয় হয়ে যাওয়া মনকে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ করেছে।

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর '৭৬ সনে আওয়ামী লীগের পুনর্জন্মের পরও পার্টিতে কোন্দলের ফলে কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে হতাশা, উপযুক্ত কোন অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম দিতে না পারায় পার্টিতে স্থবিরতা, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি আন্তর্জাতিক বিরোধের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নীরবতার ফলে জনমনে সন্দেহ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। অনেক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমার মনোভাব নিয়ে আলোচনা করি এবং দেখলাম তারা অধিকাংশ ব্যাপারেই আমার সঙ্গে একমত। তাই ভাবলাম আমার চিন্তাধারাকে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরি এবং এতে আর কিছু না হোক গত দশ বার বৎসরের রাজনীতির সত্যিকারের চিত্র ও ইতিহাস হিসাবে এটা কাজ করতে পারে। আওয়ামী লীগের বহু কর্মী ও শুভাকাঙ্খীরা এর থেকে কিছুটা চিন্তার খোরাকও পেতে পারেন। দেশে যতগুলি রাজ-

www.pathagar.com

নৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে আওয়ামী লীগই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার দেশের মাটিতে এখনও শিকড় রয়েছে এবং ভুল ভ্রান্তি দূর করে দেশের যদি কিছু মঙ্গল করা সম্ভব তবে এ পার্টির মারফতই সম্ভব এটা আমি বিশ্বাস করি। পাঁচ ছয় বৎসর ক্ষমতায় থেকে এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে জিয়া সাহেব অবশ্য বি, এন, পি'কে দেশে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন এটা অনস্বীকার্য তবে আওয়ামী লীগের শিকড় যত গভীরে প্রবিষ্ট, বি, এন, পির তা নয়। তাই আজ যখন বর্তমানে সামরিক সরকারের শাসনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে বিকল্প খুঁজছে এ সময়ে নিজেদের ভুল ভ্রান্তি দূর করে আওয়ামী লীগকে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দ্যেশ্যেই আমার এ কলম ধরা। আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমার মতামতের সঙ্গে সকল ব্যাপারে একমত না হলেও দুএকটি মতামতও যদি গ্রহণযোগ্য মনে করে পার্টি নীতিতে সেটা কার্য্যকরী করতে চেষ্টা করেন তবে আমার পরিশ্রমকে আমি স্বার্থক মনে করব।

এ প্রবন্ধে আমি যা বলেছি এটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব মত। রাজনৈতিক সমস্যাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে, এর সমাধানও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত। তাই অনেকের সঙ্গে হয়ত আমার মত মিলবে না। তবে এতটুকু বলতে পারি নিঃশংক চিত্তে আওয়ামী লীগকে আরও জীবন্ত ও শক্তিশালী করার সদিচ্ছা নিয়েই এই লেখা লিখেছি। আমি আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করি নিজেদের ভুল ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনায় অমঙ্গলের চাইতে মঙ্গলই বেশী হয়। আত্মসমালোচনা পার্টিকে ভুল ভ্রান্তি দূর করে জীবন্ত ও শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। তাই এ লেখার জন্য আওয়ামী লীগের উদার মনোভাব সম্পন্ন বন্ধুরা আমাকে ভুল বুঝবেন না আশা করি।

আমার এ প্রবন্ধ থেকে কারো কারো হয়তো ধারণা হতে পারে দলীয় কোন্দল অসাধুতা ও দূর্নীতির সঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রায় সব নেতাই জড়িত ছিল এবং সৎ পরামর্শ দিয়ে দেশের সত্যিকার পরিস্থিতি পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গোচরে এনে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালনা করার চেষ্টা কেউ করেনি। সত্যিকার ঘটনা তা নয়। আওয়ামী লীগের মধ্যে বেশ কিছু নেতা ও

www.pathagar.com

কর্মী অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ন্যায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের দায়ীত্ব পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং পার্টিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় তাদের কোন সাধু প্রচেষ্টাই সফল হয়নি।

এখানে একটা কথা আমি উল্লেখ করতে চাই যদিও ভূমিকায় কথাটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। অনেকেই অনেক সময় বলেন স্বাধীনতার পর পরই শেখ সাহেবের বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যারা পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগীতা করেছিল তাদের সবাইকে হত্যা করা উচিৎ ছিল। তা করলে আজ আর স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে ক্ষমতা যেতনা। আমার মনে হয় এ ধারণা ঠিক নয় এবং তৎসময় বাস্তবসম্মতও ছিলনা। স্বাধীনতার পর দেখা গেল একই পরিবারে এক ভাই আওয়ামী লীগার, আর এক ভাই যে পাক বাহিনীর সঙ্গে সহযোগীতা করেছে সে মুসলীম লীগার। এই অবস্থায় এক ভাই পার্টিতে থেকে আর এক ভাইকে কিছুতেই নিহত হতে দিতনা। এটা করতে গেলে '৭২ সনেই পার্টিতে দারুণ গণ্ডগোল বেধে যেত। এছাড়া আরও একটা দিক আছে বিবেচনা করার। ৬ দফার কোথাও পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ছিলনা। ৬ দফা না মেনে পাক বাহিনী হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করাতেই স্বাধীন বাংলার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। এই হঠাৎ পরিবর্তনের সঙ্গে কেউ যদি সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বা নিজের মানসিকতাকে সম্পূর্ণ রূপে খাপ খাওয়াতে না পেরে থাকে তার জন্য তাকে মৃত্যুর মত চরম শাস্তি দেওয়া উচিৎ হতনা। এ ছাড়া এমনও বহু লোক ছিল যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত। তাই স্বাভাবিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যে কাজ তারা করেছে তার জন্য তাদের সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করে চরম দণ্ড দিলে ঘোরতর অন্যায় হতো। এ ছাড়া ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বেশ কয়েক মাস ধরে যদি আলোচনা চলতো এবং এ আলোচনার মধ্য দিয়ে পাক সরকারের অযৌক্তিক আচরণ ও আওয়ামী লীগের যৌক্তিক দাবীর পার্থক্য জনসাধারণ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠার মত যথেষ্ট সময় পাওয়া যেত তবে তাদের মনোভাবের ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

পরিবর্তিত হওয়ার সুযোগ ঘটতো। এই রূপ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের বিরোধী দলের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দও হয়তো স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেত। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে যাওয়ায় অনেকেই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি।

তাই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা বিরোধীদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে তার সেবায় আত্মনিয়োগের যে আহবান সবাইকে জানিয়েছিলেন তা সঠিক এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তই হয়েছিল বলে আমি মনে করি। সামরিক বাহিনীর কিছু লোক তাঁকে হত্যা না করলে বিরুদ্ধ দলের যে সব নেতা বা কর্মীকে তিনি জনতার রুদ্র রোষ থেকে রক্ষা করে ক্ষমা করেছিলেন তারা তাকে ক্ষমতা চ্যুত করতে চাইলে তা স্বাভাবিক এবং নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই করতে চাইত। বরং যদি তিনি বিরুদ্ধ দলের সবাইকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতেন তবে তা সম্ভবও হতোনা এবং তাঁর নিজের দলের মধ্যেই বিরাট বিপর্যয় দেখা দিত।

উপসংহারে আমি আর একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। বর্ত-মান প্রবন্ধটিতে আমি বলতে চেয়েছি আওয়ামী লীগের মত একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠন জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ থেকে কেন এবং কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাংলাদেশের মত সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে শেখ সাহেব কেন ব্যর্থ হলেন এটা এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। সে সম্বন্ধে আলাদা একটা বই লেখার ইচ্ছা আমার রয়েছে। তাঁর এই স্বল্প-কালীন শাসন কালে তাঁকে যে জটিল ও পর্বত প্রমাণ সমস্যা সমূহের মোকাবিলা করতে হয়েছিল সেগুলি মোকাবিলার জন্য যে সুশৃঙ্খলিত শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন ছিল তার কিছুরই সাহায্য তিনি পাননি বলা চলে। তদুপরি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার ফলে স্থানীয় ও গণবিরোধী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার তাঁকে হতে হয়। স্বাধীনতার অল্পদিন পরেই ঘোড়াশাল সারকারখানায় ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ ও রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন পাটের গুদামে পর পর অনেকগুলি মারাত্মক অগ্নিকাণ্ড তাঁর আরব্ধ কার্য্যক্রমকে বানচাল করার যে একটা সুপরিকল্পিত প্রয়াস এটা অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়।

১৯৭৪ সনের বন্যার পর যে দুর্ভিক্ষ হয় তা অনেকাংশে

www.pathagar.com

ঠেকানো যেত আমেরিকা থেকে আমাদের কেনা চালের জাহাজগুলো কোন অজ্ঞাত কারণে মাঝ পথে দিক পরিবর্তন না করে যদি ঠিক সময় চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছাত এবং অনেকগুলির পৌঁছাতে অযথা বিলম্ব না ঘটত। এটা আজ পৃথিবীর সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টাই তাঁর নিহত হওয়ার আসল কারণ। সি আই এ সংঘটিত ষড়যন্ত্রে চিলির আলেন্দে নিহত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুকে বহুদিন বলতে শুনেছি "তোরা দেখিস আমার অবস্থাও আলেন্দের মতই হবে।" এটা লক্ষ্যণীয় যে '৭৫ সনে ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করে সব ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু যখন কঠোর হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন এবং '৭৩-'৭৪ সনের তুলনায় দেশ শাসনের ব্যাপারে বেশ খানিকটা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা তখনই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জরুরী সিদ্ধান্ত নিল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের জটিল সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যাপারে দেশের ও বাইরের প্রগতিশীল শক্তিগুলির প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন উপায়ে চরিত্র হননের মারফত তাকে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে হলো।

পরিশেষে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমি যে মতামত প্রকাশ করেছি পাক-ভারত উপমহাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এটা আমি সঠিক বলে মনে করি। জাতীয়তাবাদের ধারণা কোন চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে এধারণারও পরিবর্তন ঘটে। যদি কোন দিন কোন কালে পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা রাজ্য, বাংলাদেশ ও আসামের বাংলা ভাষা ভাষী এলাকা নিয়ে জনসাধারণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে কনফেডারেশান জাতীয় কোন একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হয় তবে এদেশের জাতীয়তাবাদের ধারণারও তখন পরিবর্তন হতে বাধ্য। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বহু রাষ্ট্রেরই ভৌগোলিক এলাকার পরিবর্তন হয়ে বহু নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই উপমহাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক সীমা রেখারও যে ভবিষ্যতে পরিবর্তন হবেনা এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। বাংলাদেশের অভ্যুদয় এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মোঃ আবদুল মোহাইমেন

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ

ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবা স্বাধীন করেছে ১৯৫৮ সনে। সে আজ ২৫ বৎসরের পূর্বের ঘটনা হলেও ক্যাস্ট্রো এখনও ক্ষমতায় রয়েছে পূর্ণ জনসমর্থনে। মাওসেতুং চীনের স্বাধীনতা এনেছিলেন ১৯৪৯ সনে। আজ ৩৪ বৎসর[১] পরেও তার দল ক্ষমতায় রয়েছে অপ্রতিহত ভাবে। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা এনেছিলেন বেনবেল্লা ও হুয়েরী বুমেদিন ১৯৬৩ সনে। আজ কুড়ি বৎসর পরও তার দলই দেশ শাসন করছে নির্বিরোধিতায়। নিখিল পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলকে স্বাধীন করে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করল আওয়ামী লীগ ১৯৭১ সনে কিন্তু সাড়ে তিন বৎসর যেতে না যেতেই তারা শুধু ক্ষমতাচ্যুত হলোনা তাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হলেন। আওয়ামী লীগ জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের সমর্থন হারিয়ে আজ আরও দশটি সাধারণ রাজনৈতিক দলের মত লক্ষ্যহীন ভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সহসা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা বিপ্লবের মারফত ক্ষমতায় আসার কোন আশু সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছেনা। ফিদেল ক্যাস্ট্রো, মাওসেতুং বা হুয়েরী বুমেদিন বা তার পার্টি আজ ও পূর্ণ জনসমর্থনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ ঠিক এদের মতই

১. [handwritten footnote]

www.pathagar.com

একটা রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসে এভাবে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হলো কেন ? এবং শুধু ক্ষমতা থেকেই অপসারিত যে হয়েছে তাই নয়। সাধারণ মানুষ যারা আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ও তার প্রাককালে অকুন্ঠ সমর্থন দিয়েছিল তাদের বেশীর ভাগই আজ আওয়ামী লীগ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। যদি বলা হয় আমিরিকা ও সি, আই, এর বদৌলতে এটা সম্ভব হয়েছে তবে উত্তরে বলা যায় যে আমেরিকা ও সি, আই, এ কিউবা ও চীনে ক্ষমতা দখলকারীদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার চেষ্টা কম করেনি। সেখানে তাদের চেষ্টা সফল হলোনা, এখানে হলো কেন ? আওয়ামী লীগের সকল শুভাকাঙখীদের মনে আজ এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এবং এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার উপরই আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ও জন সমর্থন পুনঃ অর্জনের সম্ভাবনা নির্ভর করছে।

১৯৬৬ সনে যখন ৬ দফা প্রোগ্রাম দেওয়া হয় তখন থেকে আরম্ভ করে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে ১৯৭১ সনে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্তীকাল ১৯৭২ সনের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত এ জনপ্রিয়তা অটুট ছিল। কিন্তু তারপর এটা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৭৪ সনের শেষের দিকে এ জনপ্রিয়তা একেবারে সর্ব নিম্ন পর্য্যায়ে নেমে যায় যখন আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃবৃন্দ দেশের লোকের কাছে অযোগ্য দুর্নীতিবাজ ও আত্মকলহপ্রিয় একটি পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭১ সনে যে পার্টি লোকের কাছে এত প্রিয় এবং যার জন্য লোকে প্রাণ দিতে কুন্ঠাবোধ করেনি সে পার্টির উপর সাধারণ মানুষের আস্থা অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় কেন এটা খুবই গভীর ভাবে চিন্তা করার বিষয়। স্বাধীনতার পর পরই জিনিস পত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। দু-বছরের মধ্যে ৬ আনার গামছা ৬ টাকায় গিয়ে দাড়ায়। ১২/১৪ টাকার শাড়ী ৬০/৬৫ টাকায় গিয়ে পৌছে। নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসের দাম হঠাৎ করে পাঁচ সাত গুণ বেড়ে যায়। তার ফলে জন মনে স্থির বিশ্বাস জন্মে যে আওয়ামী লীগের আযোগ্যতা ও পার্টির কর্মীদের লুট পাটের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ১৯৭০ এর নির্বাচনের সময়

www.pathagar.com

দেশের ৯৭%লোক আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। এর মধ্যে চোর, ডাকাত, জুয়াচোর সবাই ছিল। তাই ১৯৭২ সালে ঐসব চোর, ডাকাত, জুয়াচোর প্রভৃতি যখন নিজ নিজ পেশায় ফিরে গিয়ে সমাজবিরোধী কাজ কর্ম করতে আরম্ভ করে দিল তখন তাদের অপকর্মের জন্যও লোকে আওয়ামী লীগকে দায়ী করতে আরম্ভ করল। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে দলীয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দীন সাহেব একের পর এক কতকগুলি মারাত্মক ভুল করতে লাগলেন।

স্বাধীনতার পর পরই শেখ সাহেব একটা ভুল করলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সেটা হলো তাড়াহুড়া করে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্বিশেষে সকল পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ। জাতীয়করণ হলো সমাজতন্ত্রের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু এ পদক্ষেপকে কার্যকর ও সফল করার জন্য প্রয়োজন ছিল তিনটি অত্যাবশ্যকীয় শর্তের পূরণ। প্রথমটি হলো অত্যন্ত বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও সৎ রাজনৈতিক দল এর নেতৃত্ব দেবে। দ্বিতীয়তঃ হাজার হাজার শিক্ষিত ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বা ক্যাডার থাকবে এ প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য। তৃতীয়তঃ একটি সৎ ও বিশ্বস্ত প্রশাসন যন্ত্র থাকতে হবে সমস্ত পরিকল্পনাকে রূপ দানের জন্য। উপরোক্ত তিনটি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রচেষ্টা হিসাবে শিল্প জাতীয়করণ দেশের মানুষের মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলই বেশী করে। অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় '৭২ সনে যখন পাট ও বস্ত্র শিল্প জাতীয়করণ করা হয় তখন উপযুক্ত ক্যাডার ত ছিলইনা বিশ্বস্ত ও সৎ প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যও কতটুকু পাওয়া গিয়েছিল বলা কঠিন। এতদ্ব্যতীত আওয়ামী লীগের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতি সত্যিকার আগ্রহ কতটুকু ছিল এবং সমাজ-তন্ত্রের গতি প্রকৃতি ও তা রূপায়ন সম্পর্কে কতটুকু স্বচ্ছ ধারনা ছিল বলা শক্ত। ফলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, উপরোক্ত তিনটি শর্তের প্রায় সবগুলিরই অবর্তমানে জাতীয়করণের উদ্দেশ্য সফল ত হয়ই নাই বরং এতদিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বাণিজ্যের পদ্ধতিকে ভেঙ্গে দিয়ে অল্পদিনেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হলো। জাতীয়-

www.pathagar.com

করণ করার পর সে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো চালাবার মত উপযুক্ত লোক পার্টি ক্যাডারে না থাকায় সেগুলোকে চালাবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ, অসাধু এডমিনিস্ট্রেটারদের হাতে।

দুদিনেই আরম্ভ হল লুট। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এডমিনিস্ট্রেটার, পারচেজ অফিসার, ম্যানেজারগণ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকনেতাদের যোগ সাজসে প্রায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেই লুট করতে আরম্ভ করল। ফলে দফায় দফায় জিনিসের দাম বাড়তে লাগল। এক একটি পাটকল ও বস্ত্র কলে দুইগুণ আড়াইগুণ শ্রমিক নিয়োজিত হলো। শ্রমিক ভর্তির ব্যাপারেও কারচুপির অন্ত রইলনা। বহুস্থানে অস্তিত্বহীন শ্রমিকের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা মাহিনা নেওয়া হতে লাগল। পাটকল গুলিতে পাট এবং খুচরা যন্ত্রাংশ কেনার প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকা অপচয় হতে লাগল। সার্বিক অব্যবস্থার ফলে পাটের দর অসম্ভব কমে গেল। কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অল্পদিনেই বুঝা গেল ভারতে যেখানে পাটকলগুলি দক্ষ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের হাতে রয়েছে সেখানে বাংলাদেশে পাটকলগুলি জাতীয়করণ করে অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য পরিচালকদের দ্বারা পরিচালনা করা মস্ত বড় ভুল হয়েছে। বিশ্ব বাজারে আমরা বাজার হারাতে লাগলাম আর সে স্থান দখল করল ভারত। পাটকল জাতীয় করণ করার সময় এটা মোটেই খেয়াল করা হয়নি যে পৃথিবীতে আমরাই এক মাত্র পাট উৎপাদনকারী দেশ নই। আরও সাতটি দেশ পাট উৎপন্ন করে এবং তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে আমাদের পাট বিক্রয় করতে হয়।

বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারেও একই ব্যাপার ঘটেছে। তুলা কেনা ও সুতা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুট হলো। জাতীয়করণকৃত বস্ত্র কলের এক একজন ম্যানেজারের গড়ে মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজারে এসে দাঁড়াল। অধিকাংশ সূতা কালো বাজারের মারফৎ সরকারী মূল্যের উপর বেল প্রতি দেড় থেকে দুই হাজার টাকার অধিক মূল্যে তাঁতীদের হাতে পৌঁছাতে লাগল। বাড়লো তাঁতীদের দুর্গতি, জাতীয়করণ করতে গিয়ে দেশের অর্থনীতি লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া হলো। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতো হলোইনা, মাঝখান থেকে সমাজতন্ত্র মানে লুটপাট এই ধারণাই

www.pathagar.com

সাধারণ লোকের মনে বদ্ধমূল হলো। অবস্থা এমন হলো যে '৭০/'৭১ সনে যেখানে সমাজতন্ত্রের নামে সাধারণ মানুষ পাগল ছিল সেখানে '৭৪/'৭৫ সনে সমাজতন্ত্রের নামে কোন কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফলে সমাজতন্ত্রের আন্দোলন কম পক্ষে ৫০ বৎসর পিছিয়ে গেল। অবস্থাটা বোধহয় এরূপ করুন হতোনা যদি অবাঙ্গালীদের পরিত্যক্ত মিলগুলিকে একটা করপোরেশনের অধীন করে বাঙ্গালীদের মিলগুলিকে জাতীয়করণ না করে স্বাভাবিক ভাবে চলতে দেওয়া হতো। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে বাঙ্গালী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মিলগুলির পরিচালনা বোর্ডে একজন শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়োগ বাধ্যতামূলক করে মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকদিগকে দিতে হবে, এটা বলে দিলেই সব চাইতে ভাল হতো।

মনে রাখা উচিৎ যে, '৪৯ সনে চীন যখন স্বাধীন হয় তখন দলে হাজার হাজার শিক্ষিত ও নিষ্ঠাবান কর্মী থাকা সত্ত্বেও চীনের কম্যুনিস্ট সরকার দশ বৎসর চীনের শিল্প কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করেনি। পুরাতন মালিকদেরই সরকারী নিয়ন্ত্রণে কারখানা চালাতে দেওয়া হয়েছিল এবং দশ বৎসর পর যখন শিল্প কারখানা চালাবার মত যথেষ্ট লোক পার্টিতে তৈরি হয় শুধু তখনই পুরাতন মালিকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের এখানেও যদি অনুরূপ নীতি অনুসৃত হতো তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এতবড় বিপর্যয়ের সম্মুখীন আমরা হতাম না এবং অর্থনীতি ধ্বংসের নিন্দারও ভাগী হতাম না। বাঙ্গালীদের বস্ত্রকলগুলি যদি জাতীয়করণ না করা হতো তবে গত বার বৎসরে সূতার দামের এত অধিক বৃদ্ধি হতোনা। '৭৫ সন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ শাসনামলে এমন কোন বৎসর যায় নাই যে বৎসরে অন্ততঃ একবার সূতার দাম বাড়ান হয়নি। কোন কোন বৎসরে দুই বারও বাড়ান হয়েছিল। এ অবস্থা চলতে থাকে ১৯৮২ সনের শেষ পর্যন্ত। প্রতি বৎসরই নানা অজুহাতে বি. টি. এম. সি সূতার দাম দু তিনবার বাড়িয়েছে। অথচ ১৯৮২ সনের শেষ দিকে যখন বাঙ্গালীদের মিলগুলি পুরাতন মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হলো

www.pathagar.com

তার পর থেকে গত এক বৎসরের মধ্যে বি. টি. এম. সি, মিল মালিক কেউই সূতার দাম বাড়ায়নি। যতদূর শুনা যায় সূতার দাম না বাড়িয়েও মিল মালিকেরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। কয়েক বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী মিল মালিকেরা তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে বলেছিলেন যে, যদি তাহাদেরকে মিল ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা তখনই তৎকালীন বি. টি. এম. সির দরের চাইতে শতকরা ২৫ ভাগ কম দরে সূতা বিক্রি করতে রাজি আছেন। সে সময় মিলগুলি ফিরিয়ে দিলে বর্তমানে সূতার দাম যা আছে তার চাইতে অনেক কম থাকত। মিল ফেরৎ পেয়ে এখন দাম কমাচ্ছেনা কেন এসম্পর্কে দু'চার জন মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেন যে মিল ফেরত নিতে গিয়ে এত দেনা তাদের ঘাড়ে নিতে হয়েছে যে এখন আর দাম কমানো সম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেন যে এত বর্ধিত মূল্যে মাল যখন বিক্রি হয় তখন তারা দাম কমাবে কেন? মোটের উপর গত কয়েক বৎসরে শিল্প ক্ষেত্রে সরকারের ভুল নীতির ফলে শিল্পপতিদের চরিত্রেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলা চলে। আগে যেটুকু দেশপ্রেম তাদের মধ্যে ছিল এখন তাও প্রায় উবে গেছে।

পাট শিল্পের ইতিহাসও প্রায় একই রকম। রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর পাটের দর অসম্ভব কমে যায় প্রথম কয়েক বৎসর। অবশ্য তার পর কিছু কিছু বাড়তে থাকে। কিন্তু ১৯৮২ সনের ডিসেম্বরে বাঙ্গালী মিলগুলি ছেড়ে দেওয়ার পর এবার দাম রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫০/৩০০ টাকায় এসে দাঁড়ায় যা গত বার বৎসরে কখনও ঘটেনি। এবার প্রত্যেকটি জুটমিল কয়েক কোটি টাকা করে মুনাফা করেছে যদিও ব্যালান্সশীটে তারা লোকসানই দেখাবে। এটা দেখাবার কারণ হলো যে তাদের এখনও ভয় আছে আওয়ামী লীগ বা অন্য কোন বামপন্থী দল যদি ক্ষমতায় আসে হয়ত আবার মিল বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা স্থির নিশ্চিত নয়। তাই যে কয় বৎসর হাতে পাচ্ছে লোকসান দেখিয়ে যতদূর সম্ভব মুনাফা গায়েব করে টাকা লুটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছে মনে হয়।

www.pathagar.com

উপরোক্ত সমীক্ষা থেকে এটা বেশ প্রতীয়মান হয় যে ১৯৭২ সনে বস্ত্র ও পাট শিল্প জাতীয়করণ আমাদের পক্ষে অনুচিত হয়েছিল। সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় সমাজতন্ত্র দেশের জন্য যত মঙ্গলজনকই হোক না কেন, উপযুক্ত ক্যাডার ও নিবেদিতপ্রাণ ও দক্ষ প্রশাসন যন্ত্র ছাড়া এদিকে পদক্ষেপ অসময়োচিত হয়েছিল যার ফলে দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত ত হয়ইনি বরং তাদের দুঃখ কষ্ট বহুগুণ বেড়েছে, মাঝখান থেকে কিছু টাউট, পরিচালক, ম্যানেজার উপকৃত হয়েছে। বাঙ্গালী মালিকেরা তাদের মিলগুলি শ্রমিকদের সঙ্গে লভ্যাংশ ভাগাভাগি করে যদি চালাত এবং অবাঙ্গালীদের পরিত্যক্ত মিলগুলি নিয়ে একটা করপোরেশন করে দিলে দুটোর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার অবস্থা বিদ্যমান থাকত। ফলে উভয় ক্ষেত্রে দেশ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল সেটা এড়ানো যেত।

'৭২ সনে পাট ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ করা যদি আমাদের ভুল হয়েছিল এ সিদ্ধান্তে আসা যায় তবে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এলে বর্তমানে বিরাষ্ট্রীয়কৃত পাট ও বস্ত্রকলগুলি আবার জাতীয়করণ করা হবে এ ধরণের উক্তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিকর হচ্ছে বলে মনে হয়। এর ফলে বাঙ্গালী উদীয়মান শিল্পপতি যারা '৭১ সনের পূর্বের অবাঙ্গালীদের শোষণের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদেরকে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে একতাবদ্ধ করতে নানা ভাবে সাহায্য করেছিল তাদেরকে অহেতুক আতঙ্কিত করে তোলা হয়। আরো একটা কথা বিবেচনা করতে হবে। মার্ক্সীয় দর্শন অনুযায়ী পুঁজীবাদের চরম পূর্ণতা লাভ সমাজতন্ত্রের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ সামন্ততন্ত্র ছেড়ে সবে মাত্র পুঁজীবাদে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, এর পূর্ণতা আসতে এখনও অনেক বিলম্ব। সময় উপযুক্ত হওয়ার আগে ইচ্ছা করলেই কাঁঠালকে পিটিয়ে পাকানো যায় না। তাই ক্ষমতায় এলে আবার সব পাট ও বস্ত্র শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করে ফেলব এসব কথা খুব বাস্তবধর্মী নয়। এতে শ্রমিক ফ্রন্টে কিছুটা আপাততঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায় কিন্তু তাতে সুদূরপ্রসারী কোন লাভ হয় না।

www.pathagar.com

শেখ সাহেব করে গেছেন তাই যুক্তিতে না টিকলেও তাকে বহাল রাখতে হবে এটা কোন সুস্থ মনের পরিচয় বহন করেনা। শেখ সাহেব মানুষ ছিলেন, ফেরেশ্‌তা ছিলেন না। তাঁর ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। শেখ সাহেব মানুষ হিসাবে যত বড় বা জ্ঞানী হোন না কেন চীনের মাওসেতুং-এর চেয়ে বড় ছিলেন না। মাওসেতুং-এর মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর নিজ হাতে গড়া কম্যুনিস্ট পার্টি বলেছে "মাও ছাড়া নূতন চীনের কথা কল্পনা করাই যায়না। নূতন চীনের জন্য চীনের মানুষ তাঁর কাছে অশেষ ঋণী তবে সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে যাওয়াটা তাঁর পক্ষে ভুল হয়েছিল। এতে চীনের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে।" এতে দেখা যায়, চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা অনেক বাস্তবধর্মী। শেখ সাহেব কোন ভুল করতে পারেন না, তাকে সমালোচনা করা যাবেনা এরূপ মনোভাব গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ নেতারা যেরূপ বিবেক বুদ্ধি বন্ধক দিয়েছে, চীন এরূপ কোন ভুল করেনি।

বাংলাদেশ হওয়ার কিছুদিন পরেই অর্থমন্ত্রী তাজুদ্দীন সাহেবের পাকিস্তানী ও ভারতীয় নোট বদলে নেওয়ার সময় সম্পর্কে গৃহীত নীতি মানুষের মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার করে। পাকিস্তানী নোট বদলে নেওয়ার জন্য মাত্র ৫-দিন সময় দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতীয় নোট বদলে নেওয়ার জন্য প্রথমে ১ মাস ও পরে আরও ১৫ দিন সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ হওয়ার পর বাংলাদেশী ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য দুই তিন মাস সমান ছিল। তার পরই বাজারে বাংলাদেশী মুদ্রার দাম ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে। মাস ছয়েক পরে বাংলাদেশী মুদ্রার মূল্য ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় দ্রুত হ্রাস পেয়ে অর্ধেক হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ভারত থেকে আমাদের প্রথম কিস্তির কারেন্সী নোট ছাপিয়ে আনা হয়। একটা গুজব রটে গেল যে আমাদের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দেওয়ার জন্য ভারত ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক ভাবে যে পরিমাণ নোট বাংলাদেশ সরকার ছাপতে দিয়েছিলেন তার দ্বিগুণ নোট ছেপে বাজারে ছেড়েছে। আমাদের টাকার মূল্য হঠাৎ দ্রুত কমে যাওয়ায় এবং এ সময় দুই

www.pathagar.com

একটি একই নম্বরের এক টাকার নোট বাজারে পাওয়া যাওয়ায় (সেগুলির বিবরণ ফটোসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তখন ছাপা হয়েছিল) উক্ত গুজবে মানুষ আস্থা স্থাপন করতে আরম্ভ করল। আমাদের টাকার মূল্য কমে যাওয়ার ফলে জিনিসের দামও হু হু করে বেড়ে যেতে আরম্ভ করল। এতে মানুষের দুঃখ দুর্দশা অনেক বেড়ে গেল এবং এসব কিছুর জন্য সাধারণ মানুষ ভারতের ডবল নোট ছাপার কল্পিত ঘটনাকে দায়ী করতে আরম্ভ করল। এ সময় মানুষ চেয়েছিল যথা-শীঘ্র ভারতীয় নোট প্রত্যাহৃত হোক এবং সময়ের স্বল্পতার সুযোগে যত বেশী সম্ভব নোট যেন জমা পড়তে না পেরে অচল ঘোষিত হয়। কিন্তু ভারতীয় নোটের বদলের সময় সীমা যখন প্রথমে এক মাস দেওয়া হলো তখনই দেশব্যাপী একটা সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। লোকে মনে করতে আরম্ভ করল আওয়ামী লীগের বহু নেতা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতে ছিলেন তাদের সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতে রয়েছে, সেগুলি এবং বড় বড় মারোয়াড়ীদের হাতে বাংলাদেশের যে সব টাকা রয়েছে সেগুলি বদল করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এত দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়েছে। এতে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রীর উপর দেশের মানুষ সাধারণভাবেই ক্ষেপে গেল এবং আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাও এতে সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

তাজুদ্দীন সাহেবকে তার দু একজন ঘনিষ্ট বন্ধু এই সময়ের স্বল্পতা ও দীর্ঘতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন যে পাকিস্তানের টাকার ব্যাপারটা হলো ডিমনিটাইজেশন (demonitization) আর ভারতের টাকার ব্যাপারটা হলো প্রত্যাহার বা উইথড্রয়াল (withdrawal), প্রথমটা হলো নির্দিষ্ট তারিখের পর অচল ঘোষণা পরেরটা হলো ভারতীয় সমস্ত টাকা প্রত্যাহার করে নেওয়া। তিনি বললেন ভারত থেকে মোট ৩৫০ কোটি টাকার নোট ছাপান হয়েছে। সত্যিই ভারত নির্দেশিত ৩৫০ কোটি টাকার বেশী নোট ছেপে বাজারে ছেড়েছে কিনা সেটা আমি জানতে চাই। লম্বা সময় দিলাম যাতে সমস্ত নোট জমা হতে পারে এবং আমরা প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারি। সাড়ে তিন শত কোটি টাকার বেশী নোট জমা হলেই আমরা ভারত সরকারকে দোষী সাব্যস্ত

www.pathagar.com

করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারব। একই নম্বরের দুটি নোট ছাপার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, আমাদের বিদেশী মুদ্রা না থাকায় প্রথম কিস্তির নোট বাধ্য হয়েই ভারত থেকে বাকীতে ছাপাতে হয়েছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ছাপাতে গিয়ে নম্বর মেশিন না ঘুরার ফলে দুএক ক্ষেত্রে একই নম্বরের নোট বেরিয়ে পড়েছে। লক্ষ-নীয় যে এক টাকার নোটের সংখ্যা বিপুল পরিমাণ হওয়ায় ত্রুটি শুধু ঐ নোটের ক্ষেত্রেই হয়েছে। জনমনে বিভ্রান্তি দূর করণার্থে ভারতের নোট প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে অধিক সময় দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রেস নোট ইসু করতে অনুরোধ করলে তাজুদ্দীন সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, কতকগুলি সাধারণ মানুষ কি বলে বা ভাবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি রাজী নন। চিলে কান নিয়ে গেছে বললে চিলের পিছনে দৌড়াতে হবে নাকি?

সরকার পক্ষ থেকে কোন ব্যাখ্যা না দেওয়ার ফলে উপরোক্ত গুজবকে লোকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তাজুদ্দীন সাহেবকে ভারতের দালাল বলে অভিহিত করতে লাগল। যে তাজুদ্দীন সাহেবের নেতৃত্বে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল এবং যার নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, '৭২ সালের প্রথম দিকেও যিনি এদেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন এই নোটের ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে তিনি রাতারাতি অত্যন্ত নিন্দার ও সমালোচনার পাত্র হয়ে পড়লেন। এটা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। হয়তো ব্যাখ্যা দিয়ে প্রেস নোট ইসু করলে লোকের সন্দেহ অনেকটা কেটে যেত কিন্তু একগুয়েমি করে সাধারণ লোকের মনোভাবের কোন মূল্য না দেওয়ার ফলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি অধিকাংশ দেশবাসীর কাছে ভারতীয় দালাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। একারণেই শেখ সাহেব যখন তাকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করলেন দেশের কোথাও কোন প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না। এ বরখাস্তে দেশের কোথাও প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলেও আওয়ামী লীগের কর্মী মহলে শেখ সাহেবের এ কাজটি দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

দেশবাসী যাই ভাবুক আওয়ামী লীগ কর্মীরা কিন্তু তাজুদ্দীন সাহেবকে অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও আওয়ামী লীগ পার্টিতে অনেক নেতার চাইতে ভাল লেখাপড়া জানা ও জ্ঞানী লোক বলে মনে করত। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে তাঁর যত স্পষ্ট ধারণা ছিল অন্যদের তত স্বচ্ছ ধারণা ছিল কিনা সন্দেহ। পার্টিতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে তিনি ছিলেন শেখ সাহেবের ডান হাত, এটাই ছিল কর্মীদের ধারণা। তাই রাজনৈতিকভাবে তাঁকে ধ্বংস করতে গিয়ে শেখ সাহেব বোধ হয় সে ডান হাত নিজেই ভেঙ্গে দিয়ে নিজের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছিলেন বলে অনেকে মনে করে।

যাহোক ভারতীয় নোট প্রত্যাহার প্রসঙ্গের সমাপ্তি টেনে প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে নোট প্রত্যাহৃত হওয়ার কয়েক মাস পর যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব পত্রিকায় বের হলো তখন দেখা গেল ভারত থেকে মুদ্রিত ৩৫০ কোটি টাকার মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা জমা হয় নাই। ৪০ লক্ষ টাকা কম জমা হয়েছে। তাতে পরিষ্কার প্রমাণ হলো যে দ্বিগুণ টাকা ছাপা হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গুজব। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশিত হলেও তাজুদ্দীন সাহেব রাজনৈতিক-ভাবে শেষ হয়ে গেলেন এবং সেই সঙ্গে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাও প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

এর পূর্বে তাজুদ্দীন সাহেব বর্ডার ট্রেড বা সীমান্ত ব্যবসা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা নিয়েছিলেন যেটা শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির পক্ষে অশেষ ক্ষতির কারণ হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই ভারত ও বাংলাদেশের দশ মাইলের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা চালু হয়। যে কোন লোক ভারত বা বাংলাদেশ থেকে স্ব স্ব দেশের সীমান্তের শুল্ক ঘাটিতে শুল্ক জমা দিয়ে যে কোন মাল নিয়ে দশ মাইলের মধ্যে বেচাকেনা করতে পারত। এভাবে অবাধ বাণিজ্যের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বললেন এমনিতেই তো কোটি কোটি টাকার মাল পত্র এপার ওপারে চোরাচালান হয় এবং তাতে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার কেউ শুল্ক পায়না। নূতন ব্যবস্থায় ঐ মালই শুল্ক ঘাটিতে শুল্ক দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া হবে এবং তাতে দুই সরকারই রাজস্ব পাবে। পূর্বে বি, ডি, আর, এবং বি, এস, এফ, এর লোককে ঘুষ দিয়ে সীমান্ত পার করতে হতো। এখন আইন সিদ্ধ ভাবে নিতে পারবে বলে লোকে শুল্ক দিয়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করবে। ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে এরকম বন্ধু মানুষ দু'চারজন তাকে বললেন যে অধিকাংশ লোকই তার বাড়ী থেকে দশ মাইল দূরের শুল্ক ঘাটিতে মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রকার আগ্রহ না দেখিয়ে সোজা সীমান্ত পার হয়ে মাল বেচে দিয়ে আসবে। তাতে নানা প্রকার বাধা বিপত্তি পূর্বে থাকার ফলে যে পরিমাণ মাল চোরা চালানের মারফত দেশের বাইরে যেত এখন তার চাইতে অনেক বেশী মাল দেশের বাইরে চলে যাবে এবং কোনও শুল্ক বাংলাদেশ সরকার পাবেনা। এই মতের সঙ্গে অর্থমন্ত্রি একমত হলেন না। বরং এই মন্তব্যের দ্বারা বাংলাদেশের সদ্য স্বাধীন হওয়া মানুষদের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে বলে মনে করলেন।

ওপেন বর্ডার ট্রেড আরম্ভ হলো এবং অল্প দিনেই এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়েছে দেখা গেল। সীমান্ত শুল্ক ঘাটিতে এক পয়সাও জমা হলো না। এদিকে লক্ষ লক্ষ মণ ধান, চাউল ও পাট সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেল। বাধা বিপত্তির ফলে পূর্বে যে পরিমাণ মাল সীমান্ত অতিক্রম করত এখন তার দশ বিশ গুণ মাল বাইরে চলে গেল। এই বর্ডার ট্রেডের ব্যাপারটি এক বৎসরের মেয়াদের জন্য দুদেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। এক বৎসর মেয়াদ পার হওয়ার বহু পূর্বেই বাংলাদেশ সরকার এর ক্ষতিকর দিকটা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে কিছু করণীয় ছিলনা। যা হোক এক বৎসর পার হওয়ার পর সীমান্ত বাণিজ্যের চুক্তি নবায়ন না করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা এর মধ্যে হয়ে গিয়েছে। '৭১ সনে অনুকুল আবহাওয়ার ফলে মুক্তি যুদ্ধ চলা স্বত্বেও এদেশে প্রচুর পরিমাণ ধান হয়েছিল। তখন এদেশে চাউলের দাম ছিল ৩৫ থেকে ৪০ টাকা মণ। উন্মুক্ত সীমান্ত বাণিজ্যের ফলে লক্ষ লক্ষ মণ ধান, চাউল

www.pathagar.com

ভারতে চলে যাওয়ায় স্বাধীনতার ছয় মাসের মধ্যেই চল্লিশ টাকা মণের চাউল একশত টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়। ফলে দেশের মানুষের মনে হতাশা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যেটা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে মোটেই সুখের ছিলনা। সীমান্ত বাণিজ্যের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি যতদূর সম্ভব অর্থনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত ছিল মনে হয়। এটা একটা অনিচ্ছাকৃত ভুলই হয়েছিল বলা চলে।

আওয়ামী লীগ চীন বা ভিয়েতনামের কম্যুনিষ্ট পার্টির মত আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল ছিলনা। পশ্চিমারা সব লুটে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের শোষণের ফলেই আমাদের যাবতীয় দুঃখ, তারা চলে গেলে তাদের সব সম্পত্তির মালিক আমরা হব এরূপ একটা অদ্ভুত ও অযৌক্তিক ধারণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে অধিকাংশ কর্মী এই রাজনৈতিক সংগঠনে যোগ দেয়। এর মধ্যে সত্যিকারের আদর্শনিষ্ঠ ও দেশপ্রেমিক কর্মী যে একেবারে ছিলনা তা নয়। তবে তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। ৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন ও আগরতলা কেসের ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭/৬৮ সনে যখন আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে আরম্ভ করল তখন আওয়ামী লীগ অফিসে গেলে দেখা যেত চেয়ার দখল করে আছে যত নূতন নূতন মুখ। পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্মীরা বসার চেয়ার পর্যন্ত পেতনা। অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। তখন অনেকেই পার্টিতে কার্ড সিস্টেম, যদ্বারা কর্মীদের অতীত সার্ভিসের রেকর্ড পাওয়া যেত এবং কে কতদিনের কর্মি তা জানা যেত, তা চালু করার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল। দলীয় অনেক নেতা বিশেষ করে পার্টি প্রধান এটাকে মোটেই গুরুত্ব দেননি। ফলে সুবিধাবাদী, চরিত্রহীন বহু লোক আওয়ামী লীগের কর্মী পরিচয় দিয়ে যত্র তত্র লুট আরম্ভ করে দিল। ১৯৭৩ সনে তেলের দাম বাড়ার ফলে পৃথিবীব্যাপী জিনিস পত্রের দাম এমনিতেই অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের নামে কতগুলি লোকের অবাধ চুরি ও লুণ্ঠন অবস্থাকে আরও সঙ্গিন করে তুলল। এ সময় কঠিন হাতে প্রথম থেকেই এটা বন্ধ করা উচিৎ ছিল। কিন্তু কর্মীদের প্রতি শেখ মুজিবের

www.pathagar.com

অপরিসীম মমতার ফলে বা নিজের মানসিক দুর্বলতার ফলে দৃষ্টান্তমূলক অপরাধের জন্য শক্ত হাতে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। চারদিকে যখন প্রচণ্ড অরাজকতা ও লুটপাট চলছিল তখন তা কঠিন হস্তে দমন করার জন্য পার্টির কোন কোন মহল থেকে শেখ সাহেবকে শক্ত হওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ জানান হয়, গ্রেফতার-কৃত লোকেরা আওয়ামী লীগের কর্মী বা কর্মীর আত্মীয় হলেও তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য চারদিক থেকে দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। যতদূর মনে পড়ে '৭২ সনের শেষ দিকে যখন সিগারেট ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুষ্প্রাপ্যতার সুযোগ নিয়ে কালবাজার দেশব্যাপী হঠাৎ জেঁকে বসে তখন পুলিশ দিয়ে মোহাম্মদপুর এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালানোর ফলে জনৈক ছাত্রনেতার বাসভবন থেকে ৯ লক্ষ সিগারেট পাওয়া যায়। এ ঘটনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হওয়া স্বত্ত্বেও উক্ত ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর '৭২ সনের জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী মার্চ পর্যন্ত দেশে তেমন লুটপাট আরম্ভ হয় নাই। অল্প কিছু লোক, যারা প্রথম থেকেই পেশাগতভাবে লুটেরা ছিল শুধু তারাই লুটপাট আরম্ভ করে। ছাত্র ও সাধারণ যুবক সম্প্রদায় যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে কমবেশী প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল বেশ কিছুটা দেশাত্মবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ থাকার ফলে তারা লুটপাটে যোগ দেয়নি। কিন্তু কয়েক মাস পরে যখন তারা দেখল যে লুটের জন্য শাস্তিত হচ্ছেইনা বরং লুটলব্ধ অর্থের বলে লুটেরারাই দেশের রাজ-নৈতিক অঙ্গনে ও পার্টিতে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে তখন আদর্শনিষ্ঠ প্রায় সব যুবক ও কর্মীর মনোবল ভেঙ্গে গেল। তার ফলে আরম্ভ হলো দেশব্যাপী লুটের মারফত ভাগ্য পরিবর্তনের উন্মত্ত প্রয়াস। প্রথম থেকে যদি দোষী ব্যক্তিদের নির্মম হস্তে দমন করা হতো তবে দেশের ইতিহাসই অন্য রকম হতো মনে হয়। যতদূর মনে পড়ে '৭৩ সনের শেষভাগে লুটপাট ও কালোবাজারী বন্ধের জন্য শেখ সাহেব দেশব্যাপী সৈন্য নামিয়ে দিয়েছিলেন। সপ্তাহখানেক আর্মি অপারেশনের ফলে

www.pathagar.com

দেশের বহু জায়গায় জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ কমে গিয়েছিল। কিন্তু যতদূর শোনা যায় আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতৃস্থানীয় নেতা এতে বিপদগ্রস্ত হওয়ায় তাদের চাপে তিনি সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করেন। এর ফলে শুধু যে শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হলো তাই নয় সৈন্য বাহিনীর লোকের মধ্যেও তাদের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে না দেওয়ার কারণে দারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি হলো। এসময় দুর্নীতি ও কালোবাজারির একটি ঘটনা সমস্ত দেশব্যাপী দারুণ চাঞ্চল্য ও সমালোচনার সৃষ্টি করে। সেটি হল কুমিল্লার কস্‌বা এলাকার এক মহিলা এম, পি'র বাড়িতে রিলিফের কয়েক হাজার শাড়ী, লুঙ্গি, কম্বল, ও কয়েকশত দুধের টিন উদ্ধার হওয়ার ঘটনা। ঘটনাটি সামরিক বাহিনীর একজন অতি উচ্চ পদস্থ অফিসার ও কুমিল্লার ডি, সির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং কয়েক দিন যাবত বিভিন্ন পত্রিকায় দারুন সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। দেশবাসী মনে করে যে এবার একজন দোষীকে যখন হাতে নাতে ধরতে পারা গেছে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে। অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় আওয়ামী লীগের অসংখ্য শুভাকাঙ্খীকে হতাশ করে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে শেষ পর্য্যন্ত ধামা চাপা দেওয়া হল। এতে আওয়ামী লীগ ও শেখ সাহেবের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

'৭৩ সনের মাঝামাঝি যখন বেবী ফুডের দারুণ অভাব ও কালোবাজারি আরম্ভ হয়েছিল তখন হঠাৎ মোলভীবাজারের ১৩ জন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয় যেটা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ফলাও করে প্রকাশ করা হয়। দুর্নীতি দমনে শেখ সাহেব কঠোর হচ্ছেন মনে করে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের শুভাকাঙ্খী ও কর্মীদের মধ্যে একটা উৎসাহ দেখা দিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ২৪ ঘন্টা যেতে না যেতেই গ্রেফতারকৃত ব্যবসায়ীরা ছাড়া পেয়ে গেল এবং কেন তাদেরকে ছাড়া হলো সে সম্পর্কে সরকার কোন প্রেস নোটও ইস্যু করলনা। এর ফলে দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হলো যে এই সব কালোবাজারীরা নানা সূত্রে আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বা আত্মীয়তা সূত্রে জড়িত। তাই অবস্থা বেগতিক দেখে শেখ সাহেব

www.pathagar.com

তদন্ত করে শাস্তি দিতে সাহস করেননি। এরকম অরাজকতার মুখেও শেখ সাহেব যে আদর্শস্থানীয় শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্মম ও কঠোর হতে পারেননি তার কারণ বোধ হয় তিনি জীবনে কখনও বিপ্লবী পার্টির লোক ছিলেন না বলে। বিপ্লবীরা প্রয়োজনে নির্মম নিষ্ঠুর হতে পারে, (এ শিক্ষা তাদেরকে প্রথম থেকেই দেওয়া হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য দু' চার পাঁচ জনকে—প্রয়োজন হলে শত শত লোককে হত্যা করতে তারা ইতস্ততঃ করে না)। কিন্তু শেখ সাহেব ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। নিজে তিনি অত্যন্ত সাহসী পুরুষ হলেও মনটা ছিল তার অত্যন্ত কোমল। একবার টেলিভিশনে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে কোন লোক খুন করে এসে তার পা ধরে মাফ চাইলে তিনি মাফ করে দেন। তিনি নিজে বিপ্লবী ছিলেন না এবং বিপ্লবের শিক্ষাও তাঁর ছিলনা। তাই রক্তাক্ত সংগ্রামের মারফত যে দেশ স্বাধীন হয়েছে তাকে পরিচালনার জন্য যে দক্ষতা যে কঠোরতা ও বিপ্লবী জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল তা তাঁর ছিলনা।

(দেশে লুটপাট যখন চরম অবস্থায় চলছিল তখন তার জনৈক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন যে স্বাধীনতার জন্য যদি ৩০ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়ে থাকে তবে বাকী লোকের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে আরও জন পঞ্চাশেক লোককে গুলী করে মারার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে সর্বমোট জন পঞ্চাশেক কালো-বাজারীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলেই দেশে লুটপাট অনেকটা বন্ধ হয়ে যাবে। শেখ সাহেব তাঁর বন্ধুর কথা শুনে আঁৎকে উঠে বলেন 'ভাই আপনি জানেন না বাঙ্গালীদের গুলী করলে হিতে বিপরীত হয়'। বন্ধুটি বুঝলেন শেখ সাহেব এখনও মনের দিক থেকে ১৯৫২ সনে বাস করছেন। সে বৎসর নূরুল আমিন সাহেব রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় দুটি ছেলেকে গুলী করে গদি হারিয়েছিলেন। তাই শেখ সাহেব মনে করেছেন এখনও তাই হবে। '৫২ সন আর '৭২ সনের মধ্যে এদেশের মানুষের মানসিকতা যে কত পরিবর্তন হয়েছে সেকথা তিনি যেন অনু-ভবই করতে পারছিলেন না। এদেশের জ্ঞানী গুণী জনের অধিকাংশের মতে সত্যিই '৭২ সনের মাঝামাঝি বা শেষ দিকে কালোবাজারি ও লুট

www.pathagar.com

পাটের জন্য যদি গোটা পঞ্চাশেক লোককে ঝুলিয়ে দেওয়া যেত তবে এদেশের ইতিহাসই অন্য রকম হতো। কিন্তু শেখ সাহেব তাঁর কর্মীদের প্রতি অপরিসীম মমতা ও স্নেহের জন্য কঠোর হতে দ্বিধা করে দেশকে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও সম্ভাব্য ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।)

'৭২ সনের মাঝা-মাঝি লুটপাট, লোভ-লালসা বাঙ্গালী যুবকদের চরিত্রে যতটা না অধঃপতন ঘটাতে পেরেছিল তার চাইতে বেশী অধঃপতন ঘটাতে পেরেছিল যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশকে সাহায্যের নামে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ প্যান্ট ও শার্ট পিসের আগমন। পুরো '৭২ সন ও '৭৩ সনের শেষ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ প্যান্ট ও শার্ট পিস্ সাহায্য-হিসাবে এদেশে আসে যে গুলি পর্য্যায় ক্রমে এদেশের স্কুল-কলেজ গুলিতে বিলি করা হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই এক একটি ছেলে এই দেড় দুই বৎসরের মধ্যে দুই তিন বা কোন কোন ক্ষেত্রে চার-পাঁচ বারও সার্ট-প্যান্ট-পিস্ পায়। শহরের স্কুল কলেজের ছেলেরা যে গুলি পেয়েছিল সেগুলি মোটা-মোটি নিজেরা ব্যবহার করেছে, কিন্তু গ্রামের স্কুলের ছেলেরা যে গুলি পেয়েছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রি করে দিয়েছিল। এগুলি বেশীর ভাগই কালবাজারিদের হাত হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে চলে যায়।

বিদেশ থেকে পাওয়া এসব প্যান্ট পিস্ স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে যথেচ্ছা বিলির ফলে যে সব মারাত্মক কুফল দেখা গেছে তার মধ্যে একটা হলো প্রয়োজন না থাকলেও অতি অল্প মূল্যে কখনো কখনো বিনা মূল্যে যতগুলি সম্ভব শার্ট ও প্যান্ট পিস্ হস্তগত করার জন্য যে কোন অসাধু পন্থা অবলম্বন করার প্রচেষ্টা। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্কুলগুলিতে যেদিন কাপড় বিলি হয়েছে সেদিন গেটের বাইরে কাপড় ব্যবসায়ীদের লোকেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছাত্রদের হাতে কাপড় পৌঁছার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাপড় হাত বদল হয়ে গেল। এভাবে সাহায্যের নামে-আসা যার আনা কাপড়ই দেশের বাইরে চলে যায়। মাঝে থেকে এদেশের এতদিনের নিষ্পাপ ছেলেরা কালবাজারিতে প্রথম হাতে খড়ি পেল।

শহরের স্কুলগুলোর ছেলেরাও যারা বৎসরে দু'টি প্যান্ট দিয়েই চালিয়ে দিত তারাও যখন নূতন নূতন ডিজাইন ও রং এর চার পাঁচটি

www.pathagar.com

প্যান্ট পিস্ পেল, প্রয়োজন না থাকলেও সে গুলি ব্যবহার করার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। ফলে ছেলেরা এক দিকে যেমন হয়ে পড়ল বিলা-সের প্রতি আসক্ত তেমনি সেলাই খরচ দিতে গিয়ে অবিভাবকেরা হয়ে পড়ল সর্বসান্ত। '৭২/'৭৩ সনে যে কোন দর্জির দোকানে গেলে দেখা যেত দোকান গুলো দু'তিন মাসের মধ্যে কোন অর্ডার নিতে অক্ষম। সাহায্যপ্রাপ্ত প্যান্ট ও শার্টের অর্ডারে সবাই বুক্ড।

স্বাধীনতার পরপরই বিদেশী সাহায্যে কাপড়, দুধ, ঢেউ টিন, নগদ অর্থ প্রভৃতির বন্টন সমস্যা নিয়ে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকারকে দারুণ জটিল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। যাদের হাতে বন্টনের দায়িত্ব ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অসাধুতার ফলে বেশির ভাগ দ্রব্যই অভাবী লোকদের হাতে না পড়ে নেতাদের সচ্ছল আত্মীয় স্বজনের হাতে পড়তে লাগল। এসব রিলিফের মাল যাদের হাতে পড়ল তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক ব্যবহার করে বাকীটা কালোবাজারে বিক্রি করে দিতে আরম্ভ করল। এই রিলিফের মাল বন্টন নিয়ে বিভিন্ন জেলায়, থানায় কর্মী ও বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক কোন্দল ও রেষারেষি এক মর্মান্তিক দুঃখজনক পর্যায়ে পৌছে। রিলিফের মাল বেচে ভাগ্য পরিবর্তনের নেশা যেন প্রত্যেককে পেয়ে বসে।

নিজেদের মধ্যে কোন্দল হানা-হানি এবং তৎকারনে সমগ্র পার্টিকে লোক চক্ষে হেয় হয়ে যাওয়া এসব কিছুই ঘটতনা যদি প্যান্ট পিস্ ও শার্টের ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নিতেন যে বিদেশ থেকে যত কাপড়ই আসুকনা কেন তা এক রংএর এবং এক ডিজাইনের হতে হবে। তার পরও বলে দেওয়া যেতে পারত যে বাংলাদেশের সাহায্য হিসাবে প্রেরিত কাপড়ের প্রত্যেক এক গজ বা দুই গজ পর পরই বাংলাদেশের আদ্যাক্ষরটি ছাপা থাকবে। এটা হলে কোন ছেলেই নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া একটির বেশী প্যান্ট বা শার্ট নেওয়ার মানসিক তাগিদ বোধ করতনা, কারণ এক রং বা এক ডিজাইনের একটির বেশী দুটি প্যান্ট বা শার্ট পরবার আগ্রহ সাধারণতঃ কারোও হয়না। বিভিন্ন ডিজাইন ও রং এর ফলেই প্রত্যেক ছেলে একটির জায়গায় পারলে পাঁচটি ব্যবহারে

www.pathagar.com

প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিল। শেখ সাহেব যদি ইচ্ছা প্রকাশ করতেন যে নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি বা সদিচ্ছা প্রকাশের জন্য যে দেশই কাপড় পাঠাক না কেন সব কাপড়ই তাঁর নির্দেশিত ডিজাইনের এবং রং এর হতে হবে তবে আমাদের স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা তাদের নিম্নতম প্রয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত এবং যেহেতু প্রত্যেক গজে বাংলাদেশের আদ্যাক্ষর ছাপা থাকত তাতে কোন কাপড়ই বর্ডার পার হতোনা। অবশ্য আদ্যাক্ষরটি এমন কালিতে ছাপা উচিৎ হত যা অন্ততঃ দুবার ধুলেই মুছে যেত। এখানে এটা উল্লেখযোগ্য যে আনকোরা কাপড়ই সাধারণতঃ বিদেশে পাচার হয়। দাগ মোছাবার জন্য একবার দু'বার ধোয়ার প্রয়োজন হলে সে কাপড় সীমান্ত পাচার কারীরা কখনো ক্রয় করেনা।

আওয়ামী লীগ সরকার যদি কাপড়ের ব্যাপারে এ পদক্ষেপ নিতেন তবে সুবিধা হতো যে রাস্তা ঘাটে যত ছেলে মেয়েদেরকে দেখা যেত তাদেরকে সাধারনতঃ একই রং-এর কাপড়ে দেখা যাওয়ার ফলে সমগ্র দেশের ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা ঐক্য ও ভাতৃত্বভাব গড়ে উঠার সম্ভাবনা দেখা যেত। অনেকে মনে করে যদি তখন দেশী মিলগুলিকেও একই ডিজাইনের এবং রং-এর কাপড় তৈরী করার নির্দেশ দেওয়া হতো তবে দেশের পক্ষে অতি মঙ্গল হতো। একই ধরনের কাপড় পরতে সবাইকে বাধ্য করলে আপামর সমস্ত বাংলা-দেশের লোক তাদের নিম্নতম প্রয়োজনের বেশী কাপড় ব্যবহার করতে আগ্রহী হতো না। তাতে তখন দেশব্যাপী কাপড়ের যে আকাল পড়েছিল সেটার অভাব কিছুটা মিটে যেত। দ্বিতীয়তঃ দেশের অধিকাংশ মানুষ একই রং ও নমুনার কাপড় পরলে নিজেদের মধ্যেও একটা একতা ও সাম্যের ভাব জেগে উঠত একটা নূতন জাতিকে একই চিন্তা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যেটা অতীব প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতার পর পরই সমগ্র বাংলাদেশের লোককে একই মন ও মানসিকতায় গড়ে তোলার জন্য এরূপ একটি পদক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন ছিল মনে হয়।

এক্ষেত্রে আমরা চীনের উদাহরণ দেখতে পাই। '৪৯ সনে চীন স্বাধীন হওয়ার পর সরকার পুরুষ ও নারীদের সমগ্র দেশব্যাপী গাঢ়

www.pathagar.com

সবুজ রং-এর এক প্রকার শেড এর কাপড় পরা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিল। চেয়ারম্যান মাওসেতুং হতে আরম্ভ করে কৃষক শ্রমিক সবাই একই রং-এর এবং একই খতের কাপড় পরতে আরম্ভ করল তাতে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বেশ ভূষায় আর রইল না। বাধ্যতামূলক-ভাবে এই একই রং-এর পোশাক পরিধানের নির্দেশ প্রথম ১৫/১৬ বৎসর ছিল। তার পর জাতি গঠনের ভিত্তি যখন সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হলো এবং এর মধ্যে মিলগুলিও প্রচুর উৎপাদনের মারফত দেশের প্রয়োজন পূর্ণভাবে মেটাতে সক্ষম হলো তখন পোশাকের ব্যাপারে সেদেশে আর আগের মত কঠোরতা রইলনা।

অনেকে মনে করেন চীনের মত নারী পুরুষের একই পোশাক আমদের দেশে তখন প্রচলন করা সম্ভব না হলেও সমগ্র নারী সমাজের জন্য এক প্রকার এবং পুরুষের জন্য অন্য রকমের পোষাক প্রবর্তন করা সম্ভব ছিল। স্বাধীনতার পর পরই এটা করা অবশ্য সম্ভব ছিল না। তবে দু'তিন বৎসরের মেয়াদী একটা সুচিন্তিত প্রোগ্রাম নিলে এটা কার্যকারী করা অসম্ভব ছিলনা। '৭২ সনে জনসাধারণের উপর শেখ সাহেবের যে অসাধারণ প্রভাব ছিল তিনি যদি এরূপ কোন কার্যক্রম দেশবাসীকে দিয়ে গ্রহণ করাতে চাইতেন সেটা বোধ হয় পারতেন। পোশাকের ব্যাপারে এইরূপ কোন বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নেওয়া হলে জাতীয় জীবনে এর সূদূর প্রসারি প্রতিক্রিয়া হতো।

পোশাকের ঐক্য মানুষের মধ্যে চিন্তার ঐক্যও আনয়ন করে। শুধু চিন্তার ঐক্য নয়। মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা বোধেরও জন্ম দেয়। সৈন্য বাহিনীতে এই জন্যই একই পোশাক ব্যবহার বাধ্যতা মূলক। সৈন্য বাহিনীর সদস্যদের যদি প্রত্যেককে তার পছন্দ মত পোষাক পরবার অধিকার দেওয়া হয় তবে মুহূর্তে তার সমস্ত ঐক্য, শৃঙ্খলা এবং কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে। চীন দেশের নেতৃবৃন্দ নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ বাসীকে সুশৃঙ্খল নিবেদিত প্রাণ একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে গড়ে তোলবার ইচ্ছা নিয়েই পোশাকের ব্যাপারে এতটা কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। অনেকে মনে করেন শৃঙ্খলা ও চিন্তার ঐক্যে উদ্বুদ্ধকরার জন্য সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত

www.pathagar.com

বাঙ্গালীদের জন্য এমনি ধরনের কাছা-কাছি একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। এতে নূতন নূতন ডিজাইনের কাপড় করায়ত্ব করার জন্য যে চরিত্র হননকারী প্রতিযোগিতা চলেছিল তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত এবং লক্ষ লক্ষ গজ কাপড়ের সীমান্ত অতিক্রম ও বন্ধ হতো। এধরনের সিদ্ধান্তের জন্য অবশ্য বিপ্লবী জ্ঞান ও পড়াশুনার প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আওয়ামী লীগের তদানীন্তন নেতাদের এ ধরনের পড়াশুনা প্রায় কারোরই ছিলনা, যে দু'চার জনের কিছু-কিছু ছিল তখনকার পরিস্থিতিতে তাদের বক্তব্য রাখার সুযোগও প্রায় ছিলনা বললেই চলে।

১৯৭২ সনে অবাঙ্গালীদের পরিত্যক্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে কোন প্রকার ইনভেন্ট্রি তৈরী না করেই যাকে তাকে পরিচালক বানিয়ে সেগুলি চালাতে দেওয়া হলো। ইনভেন্ট্রি তৈরী না করে চালাতে দেওয়ার দরুণ কারখানা চালু করার সময় তৈরী মালের ষ্টক কত ছিল তা আর জানবার উপায় রইলনা। ফলে আরম্ভ হলো যথেচ্ছ লুট। তখন এক একটি কল কারখানা ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার তৈরী মাল ছিল। একাত্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় দেশব্যাপী যুদ্ধ চলার দরুণ উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি সম্ভব না হওয়ায় বহু কারখানাতেই প্রচুর উৎপাদিত মাল জমা হয়েছিল। '৭২ এর প্রথম থেকেই ঐ সমস্ত মাল লুট হতে আরম্ভ হলো। লুট প্রথম আরম্ভ করলো ১৬ ডিভিশন নামে ভুয়া মুক্তি যোদ্ধারা। তারপর আরম্ভ করল পরিচালনায় যারা নিয়োজিত হয়েছিল তারা এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। এত সম্পদ বাঙ্গালী যুবকেরা কখনও এক সঙ্গে চোখে দেখেনি। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই লুটের একটা সর্বগ্রাসী বন্যায় দেশ তলিয়ে গেল। সে বন্যায় কোথায় ভেসে গেল বাঙ্গালী যুবকদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা। তারপর আরম্ভ হলো লুন্ঠিত অর্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি। অবাঙ্গালীদের পরিত্যক্ত বাড়ী ঘরের ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটেছিল। কোটি কোটি টাকার এ সমস্ত বাড়ী-ঘর দখল ও করায়ত্ত করার জন্য দেশের সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষ সরকারী কর্মচারীদের সহায়তায় এলটমেন্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য এক অশুভ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। দখল সাব্যস্ত করার জন্য

www.pathagar.com

হাজার হাজার জাল দলীল তৈরী হতে লাগল। মোটা ঘুষের বিনিময়ে একই বাড়ীর তিন জনকে এলটমেন্ট দেওয়া হতে লাগল। ফলে দখল নিয়ে আরম্ভ হল মারামারি, খুনাখুনি।

১৯৭২ সন হতে ১৯৭৪ সনের শেষ পর্যন্ত সারা দেশব্যাপী যুবকদের মধ্যে যে হানাহানি গুপ্ত হত্যা প্রভৃতি চলেছিল তার অধিকাংশই হলো লুট লব্ধ এ অর্থের ভাগাভাগি ও ঘরের দখল নিয়ে। লুটের মূল লক্ষ্যই ছিল যেনতেন প্রকারে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন। তখন যে প্রবনতা শুরু হয়েছিল তার জের এখনও চলে আসছে। দেশ জাহান্নামে যাক, তাতে ক্ষতি নেই আমার দুপয়সা হলেই হলো। আজ সমাজের দিকে তাকালে আতঙ্কিত হতে হয়। যে কোন ভাবে অর্থ উপার্জনের একটা উন্মত্ত প্রয়াস ও সর্বনাশকর মানসিকতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষের মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের এহেন অবনতি দেখে দেশের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেও মানুষের মনে আজ সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলছে লুটপাট, ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গিয়ে জনজীবন অচল হয়ে উঠেছে। এদিকে শিল্প গঠনের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলেছে ডাকাতি ও পুকুর চুরি। ফলে ডেট দেনা সার্ভিসিং-এর পরিমাণ প্রতি বছর বেড়ে চলেছে। বর্তমানে দুর্নীতি সমাজের সর্বস্তরে এমন সর্বগ্রাসী আকারে দেখা দিয়েছে যে কোন নূতন সরকার এসে যদি দেশের মঙ্গলজনক কিছু কাজ করার চেষ্টাও করে তবে সে চেষ্টাকে রূপ দেওয়ার মত উপযুক্ত সংখ্যক অফিসার, কর্মচারী বা কর্মী আদৌ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে।

সব দিক বিবেচনা করলে মনে হয় ২৫ বৎসর ধরে শাসন ও শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীদের যতটুকু দুর্বল ও চারিত্রিক অধঃপতন ঘটাতে পারেনি '৭১ সনের পরে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি লুটের সুযোগ দিয়ে বাঙ্গালীদের চারিত্রিক অধঃপতন তার চাইতে অনেক বেশী ঘটাতে পেরেছে। যুবকরাই হলো দেশের ভবিষ্যৎ। সে যুবক সম্প্রদায়ই বলতে গেলে শেষ হয়ে গেল।

আর্থিক অব্যবস্থা এবং তেলের কারণে হঠাৎ জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াও তখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের কোন্দল ও সার্বিক দূর-

www.pathagar.com

বস্থার জন্য পারস্পরিক দোষারোপ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং জনমনে হতাশা সৃষ্টি করতে কম সাহায্য করেনি। শেখ সাহেব ১৯৭২ সনের শেষ থেকে ১৯৭৪ সনের মধ্যে দলের এম, পি, এম, এন, এ, ও মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের মধ্যে দুবার শুদ্ধি আন্দোলন পরিচালনা করেন। অনেক এম, পি, এম, এন, এ, কে তিনি দুর্নীতির অপরাধে বহিষ্কার করেন পার্টি থেকে। অনেক মন্ত্রী উপমন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে মন্ত্রিসভা হতে বাদ দেন। এসব পরিষদ সদস্য মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের মধ্যে সবাই যে দোষী ব্যক্তি ছিল এমন নয়, বহু দোষীর সঙ্গে নির্দোষীও শাস্তি পেয়ে গিয়েছিল। এতে তার নিরপেক্ষতা, বিবেচনা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যপারে জনমনে বারে বারে সন্দেহ দেখা দিতে লাগলো। তিনি নিজে বহুবার বহু বক্তৃতায় একথা বলতে লাগলেন যে তিনি বিদেশ থেকে যা কিছু নিয়ে আসেন চাটার দলেরা তা খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। এ চাটার দল বলতে তিনি আওয়ামী লীগের কিছু লোককেই বুঝিয়েছিলেন। ফলে তিনি হয়তো সত্য ভাষণের জন্য সাময়িকভাবে কিছুটা ব্যক্তিগত বাহবা পেয়েছিলেন কিন্তু দল হিসাবে লোক চক্ষুতে আওয়ামী লীগের স্থান যে অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নাই।

এছাড়া দু'দুবার শুদ্ধি আন্দোলনকেও অনেকেই তার ডুবন্ত জাহাজ থেকে মাল-পত্র ফেলে দিয়ে আত্মরক্ষার অসহায় প্রয়াস বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। এটাকে ইংরেজিতে জেটিসনিং বলা হয়। অনেকে মনে করেন ক্রমাগত ভুল নীতির ও সিদ্ধান্তের ফলে যখন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য হঠাৎ করে অত্যধিক বেড়ে গেল তখন দ্রুত জনপ্রিয়তা হ্রাস হতে দেখে শেখ সাহেব অপরের উপর দোষ চাপিয়ে নিজে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছেন। শুদ্ধি আন্দোলনও সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ফলপ্রসূ হয়নি। জনসাধারণ দেখল অনেক নিন্দিত ও ধিকৃত মন্ত্রী উপমন্ত্রী গদিতে রয়ে গেল আবার যাদের সম্বন্ধে তেমন কিছু শোনা যায়নি তারা কচু কাটা হয়ে গেল। এসব দেখেও পার্টির প্রতি জনসাধারণের আস্থা অনেকটা কমে গেল।

তারপর আরম্ভ হলো ছাত্রলীগের মধ্যে বিরোধ। শেখ মনির নেতৃত্বে ছাত্রলীগের এক অংশ এবং সিরাজুল আলম খান ও আ,স,ম,

www.pathagar.com

আব্দুর রবের নেতৃত্বে আর এক অংশ যথাক্রমে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ও পুরানা পল্টনে দু'টি আলাদা কনভেনশনের আয়োজন করে। জাতির পিতা হিসাবে শেখ সাহেবের কোনটিতেই যাওয়া উচিত ছিলনা। কিন্তু শেখ মনির পীড়াপীড়িতে তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে নিজেকে এক গ্রুপের সঙ্গে চিহ্নিত করে অপর গ্রুপের ভীষণ বিরাগভাজন হলেন। এসময় ছাত্রলীগের অপর গ্রুপটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এবং এ ঘটনার পর থেকে তারা বক্তৃতা, লেখনী ও প্রচারনার মাধ্যমে শেখ সাহেবের ও আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তিকে সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে আরম্ভ করল। এছাড়াও এসময় স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রধান মন্ত্রী যার চেষ্টায় ও নেতৃত্বে মুজিব নগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল তার সঙ্গে শেখ সাহেবের বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা থেকে তাজুদ্দীনের বহিষ্কার শেখ সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাধুতা সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবি মহলকে সন্দিহান করে তোলে।

উপরে উল্লিখিত কারণগুলো আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে নষ্ট করে দিয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এদেশের প্রবীন ব্যক্তিগণ সমাজের বিভিন্নস্তরে যাদের বাস, যেমন উকিল, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবী, গ্রামাঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যারা রাজনৈতিক মতামত সৃষ্টি করে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় তাদের আওয়ামী লীগ থেকে সরে যাওয়ার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে মনে হয়।

হঠাৎ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্র চালাতে গিয়ে শেখ সাহেব পর্বত প্রমাণ সমস্যার সম্মূখীন হয়েছিলেন এবং তা সমাধানের ব্যর্থতা এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের অপপ্রচার দেশের এই প্রাচীন ও বয়স্ক অংশের মনে আওয়ামী লীগের প্রতি বিরক্তি যতটা না সৃষ্টি করতে পেরেছিল তার চাইতে অনেক বেশী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল শেখ সাহেব ও আওয়ামী লীগ ও তৎসহ ছাত্রলীগের কর্মীদের পাকিস্তানের প্রতি মনোভাব দর্শনে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা আপত্তিজনক ভাষায় পাকিস্তান ও তার স্রষ্টাদের ইংরেজের দালাল, দেশের শত্রু, বাঙ্গালীর শত্রু বলে নিন্দা করতে লাগল। আমাদের দেশের প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা

www.pathagar.com

যারা ১৯৬৮ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্য্যন্ত মনেপ্রাণে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে এসেছিল তারা মনে করে রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিল না, বিরোধ ছিল পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে। তারা মনে করে ১৯৪৬ সনে ভোট দিয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করে তারা ভুল করেনি। তদানীন্তন অখণ্ড ভারতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনে ভারতীয় মুসলমানরা যখন তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল তখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাকে আলাদা করে হিন্দু আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা পাকিস্তান আন্দোলন আরম্ভ করে। পাকিস্তানকে তারা ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় আবাস ভূমি হিসাবেই কল্পনা করেছিল। এই আবাস ভূমির জন্য আন্দোলন সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল বলেই তারা মনে করে। তারা মনে করে এখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে যাই মনে হোকনা কেন পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে ভারতীয় মুসলমান তথা অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ভ্রান্ত পদক্ষেপ ছিলনা। তারা মনে করে ভারত বিভক্ত না হলে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক এলাকা আমরা দেখতে পাই এটি অখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে থেকে যেত। তাতে স্বাধীন বাংলা উৎপত্তি কখনও হতোনা। স্বাধীন পাকিস্তান হয়েছিল বলেই আজকে স্বাধীন বাংলার উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। অখণ্ড ভারতের অংশ হিসাবে থাকলে তার থেকে আলাদা করে নিয়ে বাঙ্গালী মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন কখনই সম্ভব হতোনা। ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে শিখেরা হাজার চেষ্টা করেও নিজেদের স্বায়ত্ত শাসিত আবাসভূমি সৃষ্টি করতে পারছেনা। ভারতেরপূর্ব প্রান্তে নাগা ও মিজোরা গত দুই দশক ধরে আপ্রাণ চেষ্টা স্বত্ত্বেও অখণ্ড ভারতের নাগপাশ থেকে তাদের এলাকাকে মুক্ত করতে পারছেনা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ ও বিশেষ ভাবে ছাত্রলীগের কর্মীরা যখন অতি আপত্তিজনক ভাষায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও মাওলানা ভাষানী ছাড়া পাকিস্তান আন্দোলনের সকল নেতারায় পাকিস্তানের স্থপতি কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ সকলের সম্বন্ধেই অসম্মান

www.pathagar.com

সূচক কথাবার্তা বলতে লাগল তখনই প্রাচীন ও বয়স্করা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত আঘাত পেল।

এটা স্মরণযোগ্য যে ৬ দফা আন্দোলনের কোথায়ও পাকিস্তান ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা ছিলনা। ৬ দফা বিশ্লেষণ করলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থকে পুরাপুরি রক্ষা করার জন্য কনফেডারেশান জাতীয় একটা গঠনতন্ত্র তৈরী করে পাকিস্তানকে অটুট রাখার কল্পনাই মূলত শেখ সাহেব ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ছিল, এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু ভুট্টোর জিদ ও ইয়াহিয়ার মূর্খতায় শেষ পর্য্যন্ত ৬ দফার স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম পুরাপুরি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক এটা যারা ৬ দফায় ভোট দিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানিয়ে এসেছিল, বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে যারা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল--তাদের কারো কাম্য ছিল না। কিন্তু পাক বাহিনী ও পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী যখন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনের রায়কে উপেক্ষা করে গণহত্যা চালাতে আরম্ভ করল তখন এদেশের লোকেরা পরিষ্কার বুঝতে পারল পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে কোন প্রকারেই একত্র থাকা সম্ভব হবেনা। তখনই তারা অনন্যোপায় হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তাই বলে ১৯৪৬ সনে ভোট দিয়ে যে পাকিস্তান তারা গড়েছিল সেটা ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাক এটা এদেশের অধিকাংশ জনসাধারণ কামনা করেনি। তাদের মনোভাব ছিল যেন একটি যৌথ পরিবারের দুই ভাই অনেকদিন একত্রে থাকার পরে এক ভাই দেখল অন্য ভাই তাকে ক্রমাগত ঠকাচ্ছে এবং তার ন্যায্য পাওনা দিচ্ছেনা তখন ক্ষতিগ্রস্ত ভাই জোর করে অন্য ভাই-এর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল।

আলাদা হয়ে গেলেও অপর ভাইয়ের প্রতি তার পূর্ণ শুভেচ্ছাই বর্তমান ছিল। সে ভাই ধ্বংস হয়ে যাক এটা সে মনে প্রাণে কোন দিনই কামনা করেনি। বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৭৩ সনে ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে এলে যে অভাবিত পূর্ণ গণসম্বর্ধনা পেয়েছিল

www.pathagar.com

পাকিস্তানের প্রতি শুভেচ্ছার এটাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভুট্টো ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর যখন আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ও ছাত্রলীগ কর্মীরা পাকিস্তানের নিন্দায় মুখর হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের যৌক্তিকতাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসল তখনই এদেশের কোটি কোটি লোক যারা পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল এবং এর সাফল্যের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে তাদের মনে দারুণ সন্দেহ দেখা দিল।

ভারতের সাহায্যে দেশ স্বাধীন হোক এটা এ দেশের অনেকেরই কাম্য ছিলনা। কিন্তু ঘটনাচক্রে অবস্থা এমনই দাড়াল যে ভারতের সাহায্য না নিয়ে উপায় ছিলনা। যে কোন কারণেই হোক এদেশের অধিকাংশ লোকের ধারনা ছিল যে ভারত মনেপ্রাণে পাকিস্তান ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মঙ্গল কোন দিন চায়নি। শুধু পাকিস্তানকে ভাঙ্গবার লক্ষেই তারা স্বাধীনতা সংগ্রামে এত সাহায্য করেছিল, এদেশের লোকের সত্যিকার মুক্তির জন্য সাহায্য করেনি। তাদের এ ধারণা সত্য কি মিথ্যা সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তবে যখন বাংলাদেশ হয় তখন দেশের অধিকাংশ লোকের মনোভাবই এরূপ ছিল। ঠিক এসময়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের এধরণের বক্তব্য ও আচরণে অধিকাংশ প্রবীণ ও বুদ্ধিজীবী মহলের ধারণা হলো আওয়ামী লীগ ভারতীয় চিন্তা ও প্রভাবে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে কার্যকারণে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে লাগল যে ভারতীয় স্বার্থ ও ইচ্ছার বিরূদ্ধে কিছু বলার সাহস আওয়ামী লীগের নেই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ কর্মিদেরও পাকিস্তানের প্রতি এ-বিরূপ মনোভাবের জন্য দোষ দেওয়া যায়না। জন্মের পর থেকে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর অন্যায় অবিচারের কথা শোণার ফলে ছাত্র ও কর্মীদের কাছে পাকিস্তান এবং তার শাসক গোষ্ঠী সমর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যায় ও অবিচারের ক্রমাগত শিকার হতে হতে পাকিস্তান থেকে তার শাসক গোষ্ঠীকে আলাদাভাবে বিবেচনার ক্ষমতাও অধিকাংশ যুবক ও আওয়ামী লীগ কর্মী হারিয়ে

www.pathagar.com

ফেলেছিল। তাই এদেশের তরুণ সমাজ সহজেই পাকিস্তান বিরোধীদের সুকৌশল প্রচারণার শিকার হয়ে পড়েছিল।

সব চাইতে দুঃখের ও ক্ষতির কারণ হলো যখন শেখ মুজিব বাংলাদেশ হওয়ার পর পরই ঘোষণা করলেন যে ১৯৪৮ সন থেকেই তিনি পাকিস্তনের বিরূদ্ধে সংগ্রাম করে আসছেন। স্বাধীনতার পর পরই কে কত পাকিস্তান বিরোধী ছিল তা প্রমাণ করার জন্য যেন একটা মারাত্মক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল। পাকিস্তান বিদ্বেষের পরিমাণ তখন যেন স্বদেশপ্রেমের গভীরতার মাপ-কাঠি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছিল। শেখ মুজিবের সেদিনের উক্তি যে কত অসত্য ও ভিত্তিহীন ছিল ১৯৫৪ এবং '৫৫ সনে শিল্প মন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর ১৪ই আগস্ট প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির পুরাণ রেকর্ড খুলে দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৯৭২ সনে ভাবপ্রবণতার জোয়ারে যখন দেশের মানুষ ভেসে চলেছে এবং পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি মানুষের মনে জ্বল জ্বল করছে এসময় শেখ মুজিবের মত বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় নেতার সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এই অসত্য ভাষণ যে প্রবীণ ও সুধী সমাজকে কতটা হতচকিত ও হতভম্ব করে দিয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের চোখে কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল তা গভীর ভাবে ভাববার বিষয়। ফলে আওয়ামী লীগ থেকে দেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রবীণ মহল ক্রমাগত সরে যেতে লাগলো। এভাবে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ল জনসাধারণের আস্থাহীন কিছু নেতা ও বেশ কিছু নিষ্ঠাবান কর্মীর সংগঠন।

১৯৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে অবস্থা আয়ত্তে আনার অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। '৭২ সন থেকে ধারাবাহিকভাবে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছিল তার ফলে তখন যে কাজই তিনি করতে চাইতেন তাতে লোকে উদ্দেশ্য আরোপ করতে লাগল। কাউকে শাস্তি দিলে লোকে মনে করত তার দলের নেতৃস্থানীয় কারও বা তার পরিবারের কারও সঙ্গে

www.pathagar.com

স্বার্থের বিরোধ হওয়ায় উক্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ সময় আওয়ামী লীগ কর্মী ও জাসদের কর্মীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চরমে উঠে। জাসদ কর্মীদের হত্যা করার জন্য ঢালাও ভাবে মুজিব বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল বলে গুজব রটে। ব্যাপারটা কতটুকু সত্য বলা যায়না তবে উভয় পক্ষে বিশেষ করে জাসদের পক্ষের প্রচুর কর্মী যে নিহত হয় এটা অস্বীকার করা যায়না। এ সময় গ্রাম গঞ্জে অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে মানুষ রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতনা। সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা সর্ব নিম্ন পর্যায়ে এসে যখন দাঁড়াল ঠিক সেসময় শেষ চেষ্টা হিসাবে বঙ্গবন্ধু '৭৫-এ বাকশাল গঠন করলেন। এটা যে দেশের সর্বসাধারণের মনে উৎসাহ জাগিয়ে দেশব্যাপী একটা সাড়া জাগাতে পেরেছিল এমন নয়। ক্ষমতাসীন দলের নেতা হিসাবে তিনি যখন বাকশাল ঘোষণা করলেন অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে, তখন বিভিন্ন মহল থেকে বাকশালের প্রতি মৌখিক সমর্থন জানান হলেও তার সঙ্গে দেশের মানুষের কোন সংযোগ ছিলনা। প্রতিবিপ্লবীরা যখন বুঝতে পারল শেখ সাহেব ও আওয়ামী লীগ জনসাধারণ থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তখনই তারা '৭৫ এবং ১৫ই আগষ্ট রাত্রে আঘাত হানল। শেখ সাহেব, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও শেখ ফজলুল-হক মনি সবাই সপরিবারে নিহত হলেন। ক্ষমতা আওয়ামী লীগ পার্টির হাত থেকে চলে গেল কতদিনের জন্য কে জানে?

১৯৭৫ সনের প্রথমে তিনি দুর্নীতিও অরাজকতা দমনের জন্য যে কঠোর পন্থাসমূহ বা সে বৎসরের মাঝামাঝি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাকশাল নামে যে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এর সবগুলিরই সাফল্যের জন্য প্রচুর জনসমর্থন প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশ হওয়ার পর কিছুদিন যাবৎ শেখ সাহেবের যে অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল তখন উপরোক্ত উদ্যোগগুলির সাফল্যের জন্য সর্বস্তরের মানুষের অকুন্ঠ সমর্থনে যে কোন পরিকল্পনা সফল করার ইচ্ছা করলেই তিনি অতি সহজেই তা করতে পারতেন। কিন্তু তখন যেটা অতি সহজ ছিল ১৯৭৫ সনে সেটা মোটেই সহজ ছিলনা।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সামর্থ্য সম্পর্কে লোকের মনে তখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাঁর পরিবারের অনেকের, বিশেষ করে তাঁর ছেলে কামাল ও ভাগিনেয় ফজলুল হক মনির, বাংলাদেশের তদানীন্তন রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে মাত্রাহীন প্রভাব বিস্তার জনসাধারণ ভালভাবে গ্রহণ করেনি। শেখ সাহেবের তৎসময়ে গৃহিত অনেক পদক্ষেপের পিছনেই এদের অন্যায় প্রভাব ছিল বলে অনেকে মনে করে। এসব আত্মীয় স্বজনের ক্রিয়া কর্মের ফলশ্রুতিতে শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তা দ্রুত কমে যায়। তাই '৭২ সনে তাঁর পক্ষে যা সম্ভব ছিল '৭৫ সনে আর তা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর শত্রুরা এসময় তাঁকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করে। তারা স্থির নিশ্চিত হয় যে এ সময়ে তাঁকে হত্যা করলে দেশে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হবেনা। তাদের ধারণা যে সঠিক এটা তার হত্যার পর প্রমাণিত হয়ে গেল।

'৭১ সনের ১লা মার্চে ইয়াহিয়া খান গণপরিষদ স্থগিত করার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে হাজার হাজার মানুষ অফিস আদালত ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল পাক আর্মির গোলাগুলীর ভয় না করে, সেখানে এত বড় একজন সাহসী পুরুষ যার নামে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছিল, যার নেতৃত্ব ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোনদিনই সম্ভব হত কিনা সন্দেহ, তাকে যখন সপরিবারে হত্যা করা হল দেশব্যাপী কোথাও প্রতিবাদের ঝড় উঠলনা। এটাতেই বুঝা যায় শেখ সাহেব ও আওয়ামী লীগ সরকার '৭৫ সনে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ থেকে কতদূর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে শেখ সাহেবের অবদানের কথা স্মরণ করতে গিয়ে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যার জন্য বাংলাদেশের লোক চিরদিন বঙ্গবন্ধুর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে সেটা হলো ভারতীয় বাহিনীর অপসারণ। শেখ মুজিব ফিরে না এলে স্বাধীনতার পর পরই বিভিন্ন দল ও নেতাদের মধ্যে এমন কোন্দল আরম্ভ হতো যার-

www.pathagar.com

ফলে দেশব্যাপী এমন অরাজকতার সৃষ্টি হতো যে ইন্দিরা গান্ধীর শত ইচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা সম্ভব হতোনা। শুধু শেখ সাহেব ফিরে আসাতেই সাময়িকভাবে হলেও দেশে কিছুটা শান্তি শৃংখলা ফিরে এসেছিল এবং ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার সম্ভব হয়েছিল।

শেখ সাহেব যেদিন নিহত হন সেদিন যদি ঢাকা শহরে ৫০০ লোক লাঠি হাতে শ্লোগান দিয়ে রাস্তায় নেমে আসত তাহলেই ব্যাপার অন্য রকম হয়ে যেত। শেখ সাহেবের হত্যার সঙ্গে সমগ্র সেনাবাহিনীর ২ শতাংশ লোকও জড়িত ছিলনা। সর্বমোট ২০০থেকে ২৫০শত ট্যাংক বাহিনীর জওয়ান এবং দশ বার জন আর্মি অফিসার জড়িত ছিল। পাঁচ শত লোকও শ্লোগান দিয়ে বেরিয়ে এলে রক্ষি বাহিনীর লোকেরাও বেরিয়ে আসত। ফলে হত্যাকারীরা পালাবার পথ পেতনা এবং আওয়ামী লীগও ক্ষমতাচ্যুত হতোনা। এদেশের মানুষ শেখ সাহেব শক্ত হোক, সংশোধিত হোক এটাই চেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তার এই অপমৃত্যু ঘটুক এটা কেউ কামনা করেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর আজ ৮ বৎসর অতীত হতে চলেছে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে মুষ্টিমেয় অতি ত্যাগী ও নিষ্ঠাবান কিছু কর্মীছাড়া বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রায় যোগসূত্র আজ নাই বললেই চলে। নেতৃত্বের কোন্দল ও কতক গুলি মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের নীরবতাও কোন কোন ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনুভুতির বিপরীত মনোভাব প্রকাশের ফলে দেশের মানুষের সঙ্গে আওয়ামী লীগের দূরত্ব আজ আরও বেড়ে গেছে।

বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা '৭০ এর উপর। এই ৭০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে আজ আওয়ামী লীগ একটি দল মাত্র যদিও একক ভাবে সর্ব বৃহৎ দল বলে আওয়ামী লীগকে সবাই এখনও মনে করে। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর '৭৬ সনে আওয়ামী লীগ যখন পুনর্জীবিত হয় তখন থেকে আওয়ামী লীগ আজ পর্যন্ত ক্রমাগত নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সর্বশেষ ভাগ যেটা কিছু-

www.pathagar.com

দিন পূর্বে রাজ্জাক ও হাসিনা গ্রুপের মধ্যে হলো সেটাই বোধ হয় ক্ষতির দিক থেকে সব চাইতে মারাত্মক হলো। একক ভাবে ১৯৬৯ বা '৭০ সনের মত দেশের মানুষকে কোন সংগ্রামী আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা যে আওয়ামী লীগের আজ আর নেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। গণ-তন্ত্র উদ্ধারে ১৫ দলের সঙ্গে বর্তমানে জোট বাঁধাই এর প্রমাণ। '৭৬-'৭৭ সনে আওয়ামী লীগের পিছনে যে জনসমর্থন ছিল আজ তার পরিমান আরও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে তার কারণ গত সাত আট বৎসর ধরে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক পার্টি হিসাবে তেমন কোন বাস্তব অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম দিতে পারেনি। গত আট বৎসর ধরেই দেশে সামরিক শাসন চলছে। এই কয় বৎসরে অর্থনীতির কোন উন্নতি ত হয়ই নি বরং দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান চাপে সাধারণ মানুষ গত কয়েক বৎসর যাবৎ নিস্পেষিত হচ্ছে, ফলে জন জীবণ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

'৭৫ সনের নভেম্বরের পর থেকে গত আট বৎসরে দেশের সামগ্রিক অবস্থায় কোন উন্নতিত হয়ই নি বরং দিন দিন অবস্থা মন্দ হতে মন্দের দিকে যাচ্ছে। এ সময় আওয়ামী লীগ নিজের জনপ্রিয়তা ফিরে পাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। নিশ্চিত ধ্বংস থেকে বাঁচবার জন্য বাংলা দেশের মানুষ যখন মরিয়া হয়ে কোন রাজনৈতিক দলকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে একান্ত উদগ্রীব তখনও আওয়ামী লীগকে সর্বস্তরের মানুষ তার আশা আকাঙ্খা পূরণের উপযুক্ত পার্টি মনে করে এগিয়ে আসছে না। এর কারণ যতদূর মনে হয় ভারত ও বাংলাদেশ এর মধ্যেকার কতগুলি বিরোধের বিষয়, যেমন ফারাক্কা, দহগ্রাম, আঙ্গুরপোতা ও তালপট্টির ব্যাপারে আওয়ামী লীগের একান্ত নীরবতা, যেটা জনমনে এই দলের একনিষ্ঠ দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। বাংলাদেশের মানুষ ফারাক্কার ব্যাপারটাকে নিজেদের জীবণ মরণ সমস্যা বলে মনে করে। ফারাক্কা বাঁধের মারফত গঙ্গার অধিকাংশ পানি ভারত টেনে নিয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ছয়টি জেলা ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। শেখ সাহেবের সময় বৎসরাধিক কাল পর্যন্ত আলোচনার পর স্থির হয় যে গঙ্গা থেকে শুষ্ক মওসুমে বাংলাদেশ ৪৫,০০০ হাজার কিউসেক পানি পাবে। কিন্তু শেখ সাহেবের মৃত্যুর পর

www.pathagar.com

ভারত সে চুক্তি থেকে সরে গিয়ে বহু আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে ৩৫,০০০ হাজার কিউসেক দিতে রাজি হয়। শেখ সাহেবের হত্যার পর যে রাজনৈতিক পরিবর্তন এদেশে হলো এটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে জনগণ মনে করে। কিন্তু এটাকে উপলক্ষ করে শেখ সাহেবের আমলে ৪৫,০০০ হাজার কিউ-সেকের যে পারস্পরিক চুক্তি হয়েছিল তা থেকে সরে যাওয়ার ভারতের কোন অধিকার নেই এবং বাংলাদেশের সর্বস্তরের লোক এটাকে অন্যায় বলে মনে করে। এই ইসুর উপরে বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই বক্তব্য রেখেছে এবং ভারতকে দায়ী করেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার আওয়ামী লীগ আজ পর্য্যন্ত এর উপর কোন বক্তব্য রাখেনি।

গঙ্গার অধিকাংশ পানি উত্তর প্রদেশ ও বিহারে খরা মওসুমে টেনে নেওয়ার ফলে ফারাক্কা পর্য্যন্ত পানির প্রবাহ ক্রমাগত কমে আসছে। ভারত এখন যে ৩৫,০০০ হাজার কিউসেক দিতে রাজি হয়েছে ভবিষ্যতে হয়ত তাও দিতে চাইবেনা কারণ বাংলাদেশের স্বার্থের চাইতে তার কাছে পশ্চিম বঙ্গের স্বার্থ অনেক বড়। পশ্চিম বঙ্গের প্রয়োজন মিটিয়ে উদবৃত্ত থাকলে তবেই সে আমাদের দেবে। তাই গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলাদেশ বলে আসছে নেপালের সঙ্গে মিলে নেপালের পার্বত্য এলাকায় বাঁধ দিয়ে পানি সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য। এভাবে বাঁধ দিলে প্রচুর পানি সংরক্ষণ করা যাবে যা দিয়ে খরা মওসুমে ভারতের ও বাংলাদেশের উভয়ের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। এটি একটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত পরিকল্পনা এবং ভারত ও নেপাল রাজি হলে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে দিতে ওয়ার্লড ব্যাংক সম্মতি জানিয়েছে। এরূপ বাঁধ থেকে যেহেতু নেপাল প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারবে এবং তার শিল্পায়নে সুবিধা হবে তাই নেপাল বাংলাদেশের এ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত নেপালের সহযোগিতায় ফারাক্কার পানি সমস্যার মত গুরুতর একটা সমস্যার সমাধানে রাজি হচ্ছে না। ভারতের এ মনোভাবকে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত অযৌ-ক্তিক মনে করে। বাংলাদেশকে দুর্বল প্রতিবেশী পেয়ে ভারত ইচ্ছা-মত যাচ্ছে তাই ব্যবহার করছে মনে করে বাংলাদেশের লোক অত্যন্ত

www.pathagar.com

ক্ষুদ্ধ। মানুষ সাধারণ ভাবেই আশা করেছিল যে সর্ব বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ এ-ব্যাপারে একটা বক্তব্য রাখবে এবং বাংলা দেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী ও প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য ভারতকে অনু-রোধ জানাবে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে আওয়ামী লীগ আজ পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি।

দ্বিতীয়তঃ দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার ব্যাপারে ভারত তার প্রতিশ্রুতি নানা টাল বাহানা করে এখনও পূর্ণ করেনি যদিও বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী নিজ অধিকারভুক্ত এলাকা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। এসব কারণেও বাংলাদেশের বহু লোকের মনে ভারতের সদিচ্ছা সম্বন্ধে-সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ স্পষ্ট ও জোর করে কোন কথা আজ পর্য্যন্ত বলেনি।

তৃতীয় ঃ তালপট্টি দ্বীপের ব্যাপারে ভারত যে মনোভাব দেখিয়েছে তাতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ভারতের আচরণকে আগ্রাসনের সমান মনে করে। বাংলাদেশ বরাবরই যৌথ জরীপের কথা বলেছে এবং জরীপ করে যদি দেখা যায় যে দ্বীপটি ভারতের সীমায় উঠেছে তবে তার উপর দাবী প্রত্যাহার করে নিতে বাংলাদেশ আপত্তি করবেনা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ভারত বাংলাদেশের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে উক্ত দ্বীপটি তার নিজের বলে দখল করে নিয়েছে, অথচ দ্বীপটির অবস্থান থেকে এটা যে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জেগেছে এতে বাংলাদেশ সরকারের জরীপ বিভাগের কোন সন্দেহই নেই। বাংলাদেশ কর্তৃক আন্তর্জাতিক জরীপের প্রস্তাবও ভারত প্রত্যাখ্যান করেছে। অথচ অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে জাতীয় সার্ব-ভৌমত্বের সঙ্গে জড়িত এত বড় একটা ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ আজ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। ফলে দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা হয়েছে আওয়ামী লীগ কোন অবস্থাতেই ভারতের অসন্তুষ্টি ঘটাতে চায় না। তাই লোকে মনে করে দিল্লীর মুখের দিকে তাকিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে। রাজনীতি করতে হলে দেশের লোককে নিয়ে রাজনীতি করতে হবে। যে সমস্ত বিষয়ে দেশের মানুষ অত্যন্ত স্পর্শকাতর সে সমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানে হলেও একটা বক্তব্য রাখতেই হবে এবং সেটা সত্যনিষ্ঠ হতে হবে।

www.pathagar.com

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শুভেচ্ছা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এটা ঠিক কিন্তু দেশের মানুষ, যাদের নিয়ে রাজনীতি করতে হবে, তাদের স্বার্থ ও অনুভূতির চাইতে কখনও বড় নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতের সাহায্যের জন্য বাংলাদেশের লোক কৃতজ্ঞ। তাই বলে সেই সাহায্যের বিনিময়ে ভারত বিগ ব্রাদারলি ট্রিটমেন্ট করবে এটা বাংলাদেশের লোক চায়না। পশ্চিম বঙ্গের বামপন্থী সরকারের সঙ্গে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের ঘরোয়া ব্যাপারে দারুণ মতানৈক্য ও বিবাদ রয়েছে কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে জ্যোতি বসু সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত নীতি ও পদক্ষেপকে সমর্থন করে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের তদ্রূপ নীতি হওয়া প্রয়োজন।

ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের যত বিরোধই থাকনা কেন ক্ষমতাসীন সরকারের কোনো নীতি যদি সঠিক হয় তবে সেটাকে সমর্থন জানাতেই হবে। কিন্তু কি কারণে জানিনা ফারাক্কা ও বিশেষ করে তালপট্টির ব্যাপারে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে কোন বক্তব্য নিয়ে এগিয়ে না আসায় দেশের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের মনে আওয়ামী লীগের দেশপ্রেমের প্রতি সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ফলে দেশের অধিকাংশ লোক আওয়ামী লীগ থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং এখনও যাচ্ছে।

দেশে সামরিকবাহিনী একটা সংগঠিত শক্তি। এ শক্তি পুরোপুরি বিরুদ্ধে থাকলে কোন রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসতে পারে না। ক্ষমতায় আসার জন্য এবং এসে গঠনমূলক কাজ করার জন্য এই বাহিনীর সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। পুরোপুরি সমর্থন না পেলেও সামরিক বাহিনী অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকলেও চলে। কিন্তু বাংলাদেশে গত কয়েক বৎসরে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভূমিকা দর্শনে সেনা বাহিনীর অধিকাংশ লোকের ধারণা হয়েছে যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে দিল্লীর নির্দেশে দেশ পরিচালনা করবে। এবং দিল্লী বলবে যে বাংলাদেশের মত এতটুকু দেশ চালাবার জন্য এত বড় সেনা বাহিনীর প্রয়োজন নেই। তখন সেনাবাহিনী অনেক ছোট করে ফেলতে হবে। ফলে বহু লোক চাকুরিচ্যুত হবে। তাই আজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য যেভাবে হোক আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেবে না।

www.pathagar.com

এব্যাপারে ওরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ বলে মনে হয়। ক্ষমতায় আসতে হলে আওয়ামী লীগকে বিভিন্ন প্রচার, বক্তব্য ও আচরণের মারফৎ সেনাবাহিনীর এ অযৌক্তিক মনোভাবে পরিবর্তন ঘটাতেই হবে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর সেনাবাহিনীর ব্যপারে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ সেনাবাহিনীর ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে এবং ভিতরে ভিতরে সম্পর্ককে তিক্ত করে তোলে। পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাবাহিনীকে তিনি পূরাপূরি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। তাই তিনি রক্ষিবাহিনী যেটা '৭২ সনে মুক্তি যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং যেটা তার প্রতি পূরাপূরি অনুগত থাকবে বলে তিনি মনে করেন তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। এতে সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল। তারা মনে করল শেখ সাহেব তাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না, রক্ষীবাহিনীকে তাদের প্রতিদ্বন্দী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে এবং রক্ষীবাহিনীকে পূরাপূরি ভাবে গড়ে তোলার পর তাদের বাহিনীকে সম্ভবতঃ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। রক্ষী-বাহিনীর বিভিন্ন ডিভিশনকে যে শুধু দ্রুত গড়ে তোলা হচ্ছিল তাই নয়, মূল সৈন্যবাহিনীর চাইতে তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও উন্নত ধরণের অস্ত্র শস্ত্র দেওয়াতে সশস্ত্র বাহিনীর লোকের ক্ষোভ ও ঈর্ষা অনেক বেড়ে যেতে লাগল। ফলে সরকারপ্রধান হিসাবে সেনা বাহিনীতে শেখ সাহেবের অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়ে গেল। অনেকেরই তিনি বিরাগভাজন হলেন।

এসময় রক্ষীবাহিনীর ইউনিফরম নিয়েও অনেক কথা উঠল। রক্ষীবাহিনীর ইউনিফরম ও ভারতীয় বাহিনীর ইউনিফরম দেখতে একই প্রকার ছিল। হয়তো এমন হতে পারে যে রক্ষীবাহিনীর জন্য যে ইউনিফরম প্রয়োজন ছিল তা নূতন রং বা নূতন ডিজাইন অনুযায়ী অন্য দেশ থেকে ক্রয় করার মত বিদেশী মুদ্রা বাংলাদেশ সরকারের তখন ছিল না। ভারতও হয়তো এত অল্প সময়ের মধ্যে অন্য রং-এর বা ডিজাইনের কাপড় সরবরাহ করতে অপারগতা জানাবার ফলে শেখ সাহেবকে বাধ্য হয়েই ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে ব্যবহৃত রং ও ডিজাইনের কাপড় দিয়েই রক্ষীবাহিনীর পোশাক তৈরি করিয়ে নিতে হয়। রক্ষীবাহিনীর জোয়ানদের ট্রেনিংও

www.pathagar.com

দিচ্ছিল ভারতীয় অফিসাররা। সব মিলিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ দানা বাঁধতে আরম্ভ করে যেটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ১৫ই আগষ্ট '৭৫ সালে তার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

শেখ সাহেব ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রাণ ও প্রধান ব্যক্তি, তাই তার অনুসৃত নীতিকে সেনাবাহিনীর সবাই আওয়ামী লীগের নীতি বলেই ধরে নিল। ফলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য আওয়ামী লীগের প্রতি একান্ত বিরূপ হয়ে গেল যেটা রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগের জন্য অতীব ক্ষতির কারণ বলে মনে হয়। সমস্ত বিষয় গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে মনে হয় বঙ্গবন্ধুর পতন ও অকাল মৃত্যুর জন্য রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি একটা প্রধান কারণ। রক্ষীবাহিনীর পোশাক ভারতীয় বাহিনীর অনুরূপ হওয়ায় বংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেকেরই ভয় হচ্ছিল যে ভারতীয় বাহিনী ইচ্ছা করলে যে কোন সময় রক্ষীবাহিনীর ছদ্মবেশে এদেশে ঢুকে পড়ে এদেশের স্বাধীনতাকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই দেশপ্রেমিক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই রক্ষী-বাহিনীর পোশাকের ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও সমালোচনা মুখর ছিল। শুধু সেনাবাহিনী কেন সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট অংশও বাংলাদেশ সরকারের এসব সিদ্ধান্তকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি।

সেনাবাহিনীর বহু অফিসারের সঙ্গে আলাপ করে দেখা গেছে মুক্তিযুদ্ধে যে সব অফিসার যোগ দিয়েছিল তাদেরকে একাধিক র‍্যাংকে প্রমোশন দেওয়াটা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত অফিসারদের মর্মান্তিক ভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল। তাদের মত হচ্ছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের পুরস্কৃত করার ব্যাপারে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। তাদেরকে বঙ্গবন্ধু ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ বা এক লক্ষ টাকা বা অবাঙ্গালীদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘর দিয়ে পুরস্কৃত করতে পারতেন। তাদের আত্মত্যাগের জন্য সেনাবাহিনীতে র‍্যাংক উন্নত করা অত্যন্ত অনুচিত কাজ হয়েছে। সেনাবাহিনীতে র‍্যাংক একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যে কোন অফিসার তার নীচের র‍্যাংকের সমস্ত

www.pathagar.com

লোকের সেলুট বা সালাম পায়। আর্মিতে এই সেলুট জিনিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। র‍্যাংক হারানকে আর্মির লোক অত্যন্ত অপমানজনক ও মৃত্যুতুল্য কাজ মনে করে। বাংলাদেশ হওয়ার পর যখন মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ-কারী অফিসারদের একাধিক র‍্যাংকে উন্নতি করা হলো তখন পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার, যারা এতদিন তাদের অধস্তন থেকে সেলুট পেয়ে আসছিল, তাদেরকেই তাদের সেলুট দিতে বাধ্য করা হলো।

এটা মনে রাখা দরকার সেনা বাহিনীতে র‍্যাংক সাধারণতঃ সিনিয়রিটি হিসাবেই নির্ধারিত হয়। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অধিকাংশ অফিসারদের অভিমত তারাও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভাবে একাত্ম ছিল। এখানকার অফিসাররা এখানে থাকার ফলে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছিল। যারা পাকিস্তানে আটক পড়েছিল তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে না পারলেও মনে-প্রাণে আগা গোড়াই এর সঙ্গে জড়িত ছিল।

পাকিস্তান সরকার সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এবং তার পরবর্তী কালেও প্রায় বৎসর খানেক পর্য্যন্ত ব্যারাকে পরিবার পরিজন নিয়ে অত্যন্ত অল্প জায়গার মধ্যে আটকিয়ে রেখে এক রকম বন্দী জীবন-যাপন করতে বাধ্য করে। তাই তাদের বক্তব্য হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কষ্ট তারাও করেছে যদিও এখানকার অফিসার ও জোয়ানদের মত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রাম তাদের করতে হয়নি। তাই তাদের মন্তব্য হলো শেখ সাহেব তাদের টাকা পয়সা বাড়ীঘর বা উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করলেই ভাল করতেন। র‍্যাংক বা পদোন্নতি দিয়ে উর্ধ্বতন অফিসারকে দিয়ে অধঃস্তন অফিসারকে সেলুট বা সালাম দিতে বাধ্য করে অপমান না করানই উচিত ছিল। স্মরণীয় যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে অতীব সাহসিকতার জন্য সিপাহী খোদাদাদকে ব্রিটিশ সরকার ভিক্টোরিয়া ক্রস পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছিল কিন্তু সেনাবাহিনীতে র‍্যাংক উন্নত করে নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের সেনাবাহিনীও যত সামান্যভাবেই হউক ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও মানসিকতায় পুষ্ট হয়ে গড়ে উঠেছে। তাই মনে হয় মুক্তি যোদ্ধা অফিসারদের পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধুর বোধ হয় ঠিক হয়নি।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ দেশের আপামর জনসাধারণের সক্রিয় সহায়তায় সামরিকবাহিনীর এ-দৃঢ় প্রতিরোধ ভেঙ্গে ক্ষমতায় কবে, কতদিনে আসতে পারবে তা বলা খুবই শক্ত। সামরিকবাহিনীর সম্ভাব্য এ-দৃঢ় প্রতিরোধ ভাঙ্গার ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে সব চাইতে বেশী সাহায্য করতে পারত বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু শেখ সাহেব '৭২ সনে শ্রমিক লীগ সৃষ্টি করে অধিকাংশ শ্রমিককে আওয়ামী লীগ বিরোধী করে তুলেছিলেন। '৬০ সনের শেষ দিক থেকেই বলতে গেলে বাংলাদেশের সব ফ্রন্টের সব শ্রমিকই শেখ সাহেবকে বাংলাদেশের এক মাত্র নেতা বলে স্বীকার করে নেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও জাতির পিতা ও বাংলাদেশের একমাত্র নেতা হিসাবে সবাইর সমর্থন তিনি পেতে থাকেন। কার পরামর্শে জানিনা বাংলাদেশ হওয়ার কিছুদিন পর আওয়ামী লীগের প্রতি একান্ত অনুগত থাকবে শ্রমিক লীগ নামে এমন একটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন এবং তাঁর নির্দেশ ও আনুকূল্যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিক লীগের শাখা খুলতে আরম্ভ করা হলো। প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেই গত দশ বিশ বছর ধরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন নেতার নেতৃত্বে আধিপত্য করে আসছিল। কিন্তু শ্রমিক লীগের নামে যখন নুতন একটি প্রতিষ্ঠান সেখানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেল তখনই এতদিন যে সমস্ত শ্রমিক নেতা সেখানে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল তাদের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হয়ে গেল।

দেশের নেতা হিসাবে সকল শ্রমিক নেতাই শেখ সাহেবের নেতৃত্ব মানতে রাজী ছিল কিন্তু এতদিন যেখানে তারা নিজেরা কর্তৃত্ব করে আসছে সেখানে শেখ সাহেবের নির্বাচিত ব্যক্তিদের তারা স্থান ছেড়ে দিতে রাজী হলোনা। সাধারণ শ্রমিকেরাও এতদিন যাদের নেতৃত্বে দাবী দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করে আসছে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে শেখ সাহেবের আশীর্বাদপুষ্ট শ্রমিক লীগের নূতন নেতাদের পিছনে যেতে রাজী হলোনা। তখন আরম্ভ হলো ছলে বলে কৌশলে পুরাতন সংগঠন ভেঙ্গে দিয়ে প্রত্যেক এলাকায় ও প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠার অসঙ্গত ও অযৌক্তিক প্রচেষ্টা। ফলে প্রায় জায়গাতেই শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাধল এবং শ্রমিক ঐক্য ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। শেখ সাহেব শ্রমিক লীগ গঠন করার জন্য দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতীত প্রায়

www.pathagar.com

কোন খানেই নিষ্ঠাবান কোন শ্রমিক নেতাকে খুঁজে পেলেন না। আদর্শবান নেতারা এতদিন যে সংগঠনের পতাকার তলায় কাজ করেছে সে সংগঠন ছেড়ে নূতন দলে আসতে অস্বীকৃতি জানাল। এগিয়ে এল প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধাবাদী ও সাধারণ শ্রমিকদের আস্থাহীন কিছু শ্রমিক নেতা। দেশব্যাপী আরম্ভ হলো শ্রমিক আন্দোলনের নামে চরম অরাজকতা লাল নীল বাহিনীর আতঙ্কজনক ক্রিয়াকলাপ। আরম্ভ হলো শ্রমিক নেতাদের রাষ্ট্রায়াত্ত বহু কলকারখানার পরিচালকদের সহযোগিতায় লুটপাট এবং নেতৃত্বের জন্য নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি।

যতদূর মনে পড়ে মরহুম তাজুদ্দীন সাহেব বঙ্গবন্ধুকে এপ্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন দীর্ঘ দিন ধরে শ্রমিকেরা যাদের চেনে এবং যাদের নেতৃত্বে সংগ্রাম করে আসছে তারা কোনও দিনই যত বড় নেতাই নির্দেশ দিক তার নির্দেশ মত নূতন লোকের পিছনে সমবেত হবেনা। মাঝখান থেকে শ্রমিক ঐক্য নষ্ট হবে এবং শ্রমিকরা আওয়ামী লীগের উপর বিরূপ হয়ে পড়বে। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। সরকারী আনুকূল্যের সুযোগে শ্রমিক লীগ নেতারা কোথাও কোথাও সংগঠন তৈরী করতে পারলেও সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী নিজেদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এই প্রচেষ্টার ফলে শ্রমিক নেতাদের এক বৃহৎ অংশ তাদের লক্ষ লক্ষ সদস্য সহ আওয়ামী লীগের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এটা যদি না হত বাংলাদেশের সমস্ত শ্রমিকই আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল শ্রমিক নীতির জন্য আওয়ামী লীগের ও শেখ সাহেবের প্রতি শেষ পর্যন্ত অনুগত থাকত মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষুদ্র এক অংশের উপর তার আধিপত্য রয়েছে, বেশীর ভাগই আওয়ামী লীগকে সমর্থন না করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে যাচ্ছে। তাই বর্তমান অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনী আওয়ামী লীগকে প্রতিরোধ করতে চাইলে সে প্রতিরোধ ভাঙ্গার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে কতদূর সাহায্য আসবে বলা দুষ্কর। উপরে বর্ণিত ভুল-গুলির সংশোধন করে যদি আওয়ামী লীগ নূতন নীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে শক্তিশালী নেতার নেতৃত্বে দেশবাসীর কাছে হাজির হয় তবেই আওয়ামী লীগের লুপ্ত জনপ্রিয়তা ফিরে পাওয়ার আশা আছে, নচেৎ নয়। শুধু

www.pathagar.com

প্রগতিশীল কথায় ও বক্তৃতায় দেশের আস্থা অর্জন সম্ভব হবে না এটা স্থির নিশ্চিত।

উপরে বর্ণিত তথ্যগুলিতে আওয়ামী লীগ কি কি ভুল করেছিল যার ফলে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ থেকে দূরে সরে গিয়েছে তা বলা হয়েছে। কিন্তু কি কি পদক্ষেপ নিলে আওয়ামী লীগ পুনরায় জনপ্রিয়তা ফিরে পেতে পারে তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। এখানে স্মরণীয় যে ৬ দফা একটি অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম ছিল। এই অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম যখন বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ বলে বাঙ্গালীরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করল তখনই আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে গেল। আবার যদি জনসাধারণের মধ্যে আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয় করে তুলতে হয় তবে এমন কোন নূতন অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম দেশের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর সামনে তুলে ধরতে হবে যেটা মানুষের মনে আশা আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলতে পারে। এখানে স্মরণীয় যে, প্রথমে ৬ দফাও সাধারণ মানুষের কাছে একটা এবস্ট্রাক্ট অর্থাৎ সহজে বোধগম্য জিনিস ছিল না। কিন্তু বুদ্ধীজীবী শ্রেণী যখন গ্রহণ করল তখন তাদের কাছ থেকে প্রচারের মাধ্যমে ৬ দফা সাধারণ মানুষের স্তরে পৌঁছে গেল। পরে বুঝুক বা না বুঝুক গ্রামের সাধারণ মানুষ এবং কর্মী ৬ দফাকে তাদের মুক্তি সনদ বলে বিশ্বাস করে এর বাস্তবায়নের জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করল। তাই মানুষের মনে আস্থা সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম দিতেই হবে। অবশ্য তার পূর্বে ফারাক্কা, তালপট্টি ও পাকিস্তানের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এসব সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট বক্তব্য রেখে দিল্লীর মুখের দিক তাকিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করে না এ-বিশ্বাস মানুষের মনে জন্মাতে হবে। নচেৎ যত ভাল কথাই বলা হোকনা কেন তার কোন প্রভাব দেশের সাধারণ লোকের উপর পড়বেনা।

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেওয়া আওয়ামী লীগের একার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। এজন্য আওয়ামী লীগ উদ্যোগ নিয়ে রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি সবাইকে নিয়ে সাত আট দিন ধরে একটা সেমিনার করলে ভাল হয়। সে সেমিনারে ডান বাম সকল রাজনৈতিক দলকে ডাকতে হবে। সকল মতের

www.pathagar.com

শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদদের ডাকতে হবে। তারা মন খুলে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে কি ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তার সম্বন্ধে তাদের বক্তব্য রাখবে। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাও তাদের মতামত রাখবে। নিমন্ত্রণের চিঠির ভাষা এমন হতে হবে যে, দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে এই জটিল বিষয়ের সমাধান আওয়ামী লীগ একা করতে পারছেনা, এব্যাপারে তাদের সাহায্য একান্ত ভাবে কামনা করছে দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য, এ সুর বা আবেদনটা যেন চিঠির ভাষায় পরিস্ফুট হয়ে উঠে। তখনই অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও দেশের সর্বস্তরের সুধীবৃন্দ এগিয়ে আসবে এবং সবার মিলিত আলোচনার মাধ্যমে একটি বাস্তব ও গঠনমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব হবে। যেহেতু আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে দেশের সুধী সমাজ তখন বিশ্বাস করবে আওয়ামী লীগ দেশের সত্যিকারের সমস্যা কি তা চিহ্নিত করতে পেরেছে এবং তার সমাধান জানবার জন্যও সত্যিকার ভাবে উদগ্রীব ও সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। তখন আওয়ামী লীগের প্রতি সুধী সমাজের একটি শ্রদ্ধাভাব গড়ে উঠবে যেটা ক্রমশঃ সঞ্চারিত হবে নীচের সাধারণ স্তরের দিকে। মনে হয় আওয়ামী লীগ এভাবেই তার হারান জনপ্রিয়তা অনেকটা ফিরে পেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সরকারের সমালোচনার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের এ যাবৎ কাল অনুসৃত নীতি ত্যাগ করতে হবে। আওয়ামী লীগের এযাবৎ কাল অনুসৃত নীতি হলো সরকার পক্ষ যাই করুকনা কেন তার নিন্দা করতে হবে। সরকার দশটা কাজের মধ্যে আটটা কাজ মন্দ করলেও দুটো কাজ অনেক সময় ভাল করতে পারে। যে কোন দায়িত্বশীল বিরোধী দলের উচিৎ হবে ঐ দুটি ভাল কাজের ব্যাপারে সরকারকে সমর্থন বা প্রশংসা করা। কিন্তু সব কাজেরই বিরোধিতা বা নিন্দা করলে মানুষের মনে হবে বিরোধী দল বিরোধিতার খাতিরেই বিরোধিতা করছে। তখন বিরোধী দলের সমালোচনার উপর আর লোকের শ্রদ্ধা থাকেনা। জিয়াউর রহমানের সময় দশটা মন্দ কাজের সঙ্গে সরকার দু চারটা ভাল কাজ নিশ্চয়ই করেছিল। কিন্তু বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী লীগ পক্ষ থেকে কোন দিন কোন প্রশংসা বা সমর্থন পায়নি।

www.pathagar.com

এরশাদ সরকারও সব গুলো মন্দ কাজ করেছে এমন নয়। অতিথি-নিয়ন্ত্রণ আইন, যৌতুক বিরোধী আইন, প্রত্যেক পেট্রোল পাম্পে শৌচাগার স্থাপনের নির্দেশ জাতীয় জীবনে এগুলির প্রভাব যত সামান্যই হোক এগুলিকে কয়েকটা ভাল কাজ হিসাবে ধরে নিতে হবে। যত ত্রুটিপূর্ণই হোক প্রস্তাবিত ভাগ চাষী আইন একটা ভাল প্রচেষ্টা। এটা মানতেই হবে। কিন্তু সরকারের এ প্রচেষ্টাতেও আওয়ামী লীগ কোথায় কোথায় এর ত্রুটি আছে সেটা উল্লেখ করে একে ত্রুটিমুক্ত করার মারফত দেশের মঙ্গলজনক একটি আইন তৈরি করতে সরকারকে সাহায্য করে আওয়ামী লীগ যে একটি দায়িত্বসম্পন্ন বিরোধী দল তা প্রমাণ করতে পারত। জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আস্থা অর্জন করতে হলে আওয়ামী লীগকে বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা এ-বন্ধা নীতি পরিহার করে দায়িত্বশীল বিরোধী দলের ভূমিকা নিতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ আওয়ামী লীগ তার নেতৃত্বের দুর্বলতা ত্যাগ করে সবল নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে এটা প্রমাণ করতে হবে। ১৯৭৬ সনে পার্টির পুনরুজ্জীবনের পর থেকেই পার্টিতে এই নেতৃত্ব সংকট চলছে। মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে পার্টির দ্বিধাবিভক্তিও এই নেতৃত্বের কোন্দলের ফল। মিসেস তাজুদ্দীনের কনভেনার হওয়াও এই কোন্দলের ফল। তৎকালীন প্রধান প্রধান পুরুষ নেতারা প্রেসিডেন্ট কে হবেন এ ব্যাপারে একমত হতে যখন পারলনা তখন মিসেস তাজুদ্দিন, যার তাজুদ্দীন সাহেবের জীবিত অবস্থায় তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কোন বিশেষ পরিচয় ছিলনা, তাঁকে কনভেনার করে আপাতঃসঙ্কট কাটাবার বন্দোবস্ত করা হল। অবশ্য মিসেস জোহরা তাজুদ্দীন যতদিন কনভেনার ছিলেন ততদিন পার্টিকে বেশ সক্রিয় ও প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরে ছিলেন এটা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার পরই আবার সঙ্কট দেখা দিল।

পরে শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ করে এনে যে প্রেসিডেন্ট করা হলো এটাও স্থানীয় নেতাদের মধ্যে নেতৃত্ব সম্বন্ধে একমত হতে না পারা ও মতদ্বৈধতার ফল। এটা বুদ্ধিজীবীদের কাছে আর অজ্ঞাত নেই। শেখ হাসিনা শেখ সাহেবের মেয়ে হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তার এমন কোন পূর্ব সুনাম ও পরিচিতি নেই যার ফলে তিনি হঠাৎ আওয়ামী লীগের মত বিরাট একটা রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দলের নেতৃত্বে বরিত হতে পারেন। এমন কোন ব্যক্তিগত যোগ্যতা তাঁর আছে কিনা এবিষয়ে অনেকে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। অধিকাংশ লোকই মনে করে তাঁর নিযুক্তি স্থানীয় বর্ষিয়ান নেতাদের অনৈক্যের ফলশ্রুতি। অবশ্য সময় এবং সুযোগই ভবিষ্যতে তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রমাণ করবে। এখনই কোন মতামত দেওয়া সঠিক হবে না। তবে এ যাবৎ তাঁর ক্রিয়া কর্ম অনেকের মনে আশার সঞ্চার করেছে এটা বলা যায়।

দেশের দুর্ভাগ্য শেখ সাহেবের মৃত্যুর পর যারা যোগ্যতার দিক থেকে অন্ততঃ কিছুটা তাঁর কাছাকাছি ছিলেন তারা জেল হত্যার শিকার হয়েছেন। জীবিতদের মধ্যে যারা জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে অনেকটা নীচে তারা প্রায় সবাই সমান স্তরের, তাই কেউ কারও নেতৃত্ব মানতে চায় না। এখন যে ভাবেই হউক সবাই মিলে একজনকে নেতা মানতেই হবে। কে নেতা হবেন এটা সমস্ত জেলার কাউন্সিলার ডেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে যদি স্থির করা যায় তবে সবচাইতে মঙ্গল। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যখনই মফঃস্বলের কাউন্সিলারদের সমাবেশে প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও কার্যকরি কমিটির সদস্য নির্বাচন করতে চেষ্টা করা হয়েছে প্রত্যেকবারই লাল বাহিনী নীল বাহিনীর দৌরাত্ম্যে সে কাজ করা সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। এমতাবস্থায় আর একটি বিকল্প হচ্ছে প্রেসিডেন্ট পদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে সিক্রেট ব্যালট করা। যে কয়জন সত্যিকারের প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য তারা নিজেদের মধ্যে ব্যালট করবে। প্রত্যেকে দুটি ভোট দিবে A ও B। ব্যালট পেপারে প্রত্যেক প্রার্থীর নাম থাকবে। ভোট দাতারা যে কোন দুটি নামের পাশে A ও B লিখে দেবে। A এর মূল্য B এর দ্বিগুণ, এখন ভোটের পরে যিনি B ভোট বেশী পেয়েছেন দেখা গেল, বুঝতে হবে তিনিই সব চাইতে যোগ্যতম প্রার্থী। কারণ প্রত্যেক প্রার্থী নিজেকে A ভোট দিবেই। কিন্তু অবচেতন মনে যাকে তার পরেই উপযুক্ত মনে করেন তাকেই B ভোট দেবেন। এভাবে সব চাইতে অধিক B ভোটের অধিকারী যিনি হবেন বুঝতে হবে পার্টিতে তিনিই সব চাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি। ভোটের আগে অবশ্য প্রত্যেক প্রার্থীকেই শপথ নিতে হবে যে B ভোট যিনি

www.pathagar.com

সবচাইতে বেশী পাবেন দু'বৎসর হোক, তিন বৎসর হোক তার নেতৃত্ব ও নির্দেশ সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবেন। মোটের উপর আওয়ামী লীগে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাকে মনে প্রাণে সবাই মানে, নেতৃত্বের যোগ্যতা তার পূরাপূরি রয়েছে, শুধু সঙ্কট এড়াবার জন্য কারও উপর নেতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, এ সম্পর্কে জনসাধারণকে আস্বস্ত করতে হবে। এটা কি ভাবে করা যেতে পারে সেটা আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও কর্মীদেরই স্থির করতে হবে।

চতুর্থত ঃ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আওয়ামী লীগকে তার চিন্তার মধ্যে স্পষ্টতা আনতে হবে। বর্তমানে আওয়ামী লীগ বলছে আমাদের জাতীয়তাবাদ হলো বাঙ্গালী, বাংলাদেশী নয়। এই ধারণা বোধ হয় ঠিক নয়। পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও আমাদের জাতীয়তাবাদ নিশ্চয়ই এক নয়। আমরা এক জাতি হতে পারি কিন্তু আমাদের কালচার আর পশ্চিম বঙ্গের কালচার এক নয়। দু'টোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। দেশ ভাগাভাগির পূর্বেও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা 'ঘটি' 'বাঙ্গাল' শব্দ ব্যবহার করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিত। একজাতি হলেই এক জাতীয়তা হয়না। মিসর, সৌদি আরবের লোকেরা উভয়েই আরব, তাদের ধর্মও এক তথাপি মিসর দেশের লোকেরা নিজেদের মিসরী বলে, সৌদি আরবের লোকেরা নিজেদের সৌদি বলে। এমনিভাবে লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি সবাই নেশান হিসাবে আরবী হলেও তাদের নেশনালিটি হলো যথাক্রমে লিবিয়ান, ইরাকি, সিরিয়ান প্রভৃতি। তেমনি আমরা বাঙ্গালী হলেও আমাদের দেশের নাম অনুসারে আমাদের জাতীয়তাবাদ হবে বাংলাদেশী। পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় অনুভূতি অনেকটা স্বতন্ত্র এটা অতি সত্য কথা। তাই রাষ্ট্রের নামে আমাদের জাতীয়তাবাদ হবে বাংলাদেশী। এ ছাড়া পশ্চিম বঙ্গে বাঙ্গালী বলতে শুধু হিন্দুদেরই বুঝান হয়। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা মুসলমানদেরকেও বাঙ্গালী বলে স্বীকার করেনা। তাদের মুসলমান বলে। এখনও কোন যায়গায় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার কথা বলতে গিয়ে বলা হয় বজবজে বাঙ্গালী ও মুসলমানে দাঙ্গা বেঁধেছে। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানে দাঙ্গা বেঁধেছে একথা বলেনা। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের

www.pathagar.com

বিখ্যাত উপন্যাস শ্রীকান্তের ১ম খণ্ড প্রণিধানযোগ্য, যেখানে শ্রীকান্তের সঙ্গে ইন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেখানে বলা হয়েছে "মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছেলেদের মধ্যে ফুটবল খেলা চলছিল"।

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যখন আমাকে কোলকাতায় পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী রবিউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয় তখন তাঁর ভাতৃবধূকে তাদের প্রতিবেশী কারা যখন জিজ্ঞাসা করি তখন উত্তর পাই ঐ এলাকাতে তারা দু'তিন ঘর মুসলমান বাকি সবাই বাঙ্গালী। প্রথমে বুঝতে পারলাম না পরে ভদ্র-মহিলা বুঝিয়ে দিলেন যে বাকি সবাই বাঙ্গালী মানে হিন্দু। তখন আমার ১৯৫২ সনের একটি ঘটনা মনে পড়ল। সে সময় একবার আমি ইন্টার ক্লাশে এক হিন্দু ভদ্র মহিলার সঙ্গে গল্প করতে করতে বর্ধমান যাচ্ছিলাম। বর্ধমানে ট্রেন পৌছার একটু পূর্বে ভদ্র মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন মহাশয়ের নাম? আমি উত্তর দিলাম আব্দুল মোহাইমেন। শুনে এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে সাপ দেখলে লোক যেমন চমকে ওঠে এমনি ভাবে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বিরক্তির সঙ্গে আমাকে বললেন, আপনি না বলেছিলেন আপনি বাঙ্গালী? আমি বললাম হাঁ আমি বাঙ্গালীইত। উত্তরে তিনি বললেন, আপনি কিসের বাঙ্গালী? একথা বলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে জানালার দিকে মুখ করে বসলেন। ভদ্র মহিলার আচরণে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরে অবশ্য কোলকাতা ফিরে বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলল "বুঝলি না? ভদ্রমহিলা তোকে বাঙ্গালী মানে হিন্দু মনে করে অত আগ্রহ নিয়ে গল্প করছিল। পরে নাম শুনে মুসলমান বুঝতে পেরে ক্ষুণ্ণ হয়েছে"।

এছাড়া অধুনা পশ্চিমবঙ্গে "আমরা বাঙ্গালী" বলে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে সেটা সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ। মুসলমান-দের তারা বাঙ্গালী বলে স্বীকারই করেনা। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ দর্শন জনমনে ও বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট বিতর্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে মনে হয়। বহু দেরীতে হলেও এবং অনেকের নিকট অপ্রিয় ঠেকলেও যেটা সত্য এবং বাস্তব সেটা বলতে হবে। পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ মানুষের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি,

www.pathagar.com

জীবন-বোধ প্রভৃতি চিন্তা করলে পরিস্কার মনে হয় পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান মিলে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র একটা আলাদা সত্তা। এই আলাদা সত্তাকে পরিস্কার ভাবে স্বাতন্ত্র্য দিতে গিয়ে আমাদের জাতীয়তাবাদকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ না বলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলাই শ্রেয় বলে মনে হয়।

এক দেশ হলেই সব সময় সমন্বিত একজাতি হওয়া যায়না তাই ভারতীয় জাতীয়তা প্রসঙ্গে প্রমথ নাথ বিশিকে বলতে হয়েছে "জাতীয়তাও জাতির মতো বহুরূপী। কখনো সে হিন্দু জাতীয়তা, কখনো বাঙ্গালী জাতীয়তা এবং আড়ালে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ জাতীয়তা।...... সবচেয়ে যা ব্যাপক তার নাম হিন্দু চেতনা বা মুসলিম চেতনা বা শিখ চেতনা।" (ভারতীয় সংহতি, দেশ, ৭ই শ্রাবন, ১৩৭৩)।

অবিভক্ত ভারতে যা সত্য ছিল বর্তমান বিভক্ত বাংলায়ও তাই সত্য। জাতীয়তার অন্যতম উপাদান ও ভিত্তি সংস্কৃতির দিক থেকেও যে এই স্বাতন্ত্র্য আবহমান কালের ব্যাপার তা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। হিন্দু মুসলমান জাতীয়তা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে আমাদের দেশে একটি মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে উভয়েই স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে এবং এমন একটি নতুন সংস্কৃতি গঠিত হইয়াছে যাহা হিন্দু সংস্কৃতি নহে, ভারতীয় সংস্কৃতি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং শেষ ভাগে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নায়কগণ ইহার ঠিক বিপরীত মতই পোষণ করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য এই বিপরীত মতেরই সমর্থন করে।" (বাংলাদেশের ইতিহাস)।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি আলাদা হলে এক জাতীয়তা কখনো সম্ভব নয়। অবিভক্ত বাংলার হিন্দু মুসলমানের সংস্কৃতি ও আত্মোপলব্ধি যে স্বতন্ত্র ছিল তা ডঃ এনামুল হকের নিম্নোক্ত কথা থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। "পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা মূলতঃ এক, একেবারেই এক, ইহাকে আত্মবিশ্লেষনের প্রতিক্রিয়া নামে অভিহিত করা যায়, আত্মবিশ্লেষণের

www.pathagar.com

ফলেই আমাদের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপরিচিতি ঘটে। এইখানে আসিয়া বাংলার হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন পথ ধরিল। তাহারা বুঝিলেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু হিন্দুই এবং মুসলমান মুসলমানই, তাহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক জাতি হইতে পারে নাই ও পারিবে না। তাহারা আরও উপলব্ধি করিলেন মধ্যযুগের বিশেষ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাবধি ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সময়ের হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। (মুসলিম বাংলা সাহিত্যঃ পৃঃ৩১৭)।

এখন কথা উঠতে পারে যে শেখ সাহেব যখন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বলে গেছেন এবং জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলেছেন এ অবস্থায় জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আওয়ামী লীগ কি ভাবে মেনে নিতে পারে? আমার মনে হয় কোনও দলেরই এ জাতীয় মনোভাব বাঞ্ছনীয় নয়। জিয়াউর রহমান আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং যেহেতু তিনি সূর্য পূর্ব দিকে উঠে একথা বলেছেন তাই সেটা অস্বীকার করতেই হবে এটা গোঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানে স্মরণযোগ্য যে সত্তর দশকের গোড়া থেকে শেখ সাহেব যখন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের কথা বলতে থাকেন তখন বাংলাদেশের জন্ম হয় নাই। তাই পশ্চিমাদের থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে আলাদা করে বুঝাবার জন্যই তিনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তখন বাংলাদেশ বলে আলাদা স্বাধীন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব থাকলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই বলতেন। এছাড়া শেখ সাহেবের সময় পশ্চিম বঙ্গে "আমরা বাঙ্গালী" আন্দোলন যেটা বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানদেরও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা আত্মপ্রকাশ করেনি। করলে শেখ সাহেবও জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা অন্যরকম দিতেন কিনা কে জানে?

---

www.pathagar.com

সংযোজন

[২৭ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদের পর পঠিতব্য]

বাংলাদেশ হওয়ার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্না হলের নাম বদলে সূর্যসেন হল, ইকবাল হলকে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল, ও জিন্না এভিনিউকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ করা হ'ল। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে এসবের কি প্রয়োজন ছিল? বাঙ্গালী মাত্রই সূর্যসেনের নামের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। বিদেশী শাসকের নাগপাশ থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুক্তির সংগ্রামে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁকে সম্মান দেওয়ার জন্য নূতন কোন হলের নামকরণ তাঁর নামে করা যেত। কিন্তু কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্না, যাকে পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল এরূপ বিরাট একটি জনগোষ্ঠী অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখত, তার নাম পালটিয়ে সূর্যসেন হল করা কখনও উচিত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর নামে আলাদা রাস্তার নামকরণ করা যেত। জিন্না এভিনিউর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ যারা করেছিলেন তারা জিন্না সাহেবের প্রতি যেমন অবিচার করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রতিও তেমনি সত্যিকারের শ্রদ্ধা দেখান নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এখানে স্মরণীয় যে ভারত বিভক্তির ব্যাপারে জিন্না সাহেবের সঙ্গে ভারতের কংগ্রেস নেতাদের যত মতবিরোধ ও যত শত্রুতাই হোক না কেন, তাঁরা বোম্বের বিখ্যাত পাবলিক হল জিন্না হলের নাম পরিবর্তন করেন নাই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তদানীন্তন তরুণ ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আলী জিন্নার অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে তখনকার বোম্বের নাগরিকবৃন্দ চাঁদা তুলে এই পাবলিক হলটি তৈরী করে। পরবর্তীকালে জিন্না সাহেব কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দিলেও কংগ্রেস নেতারা হলের নাম পরিবর্তনের কথা কখনও চিন্তা করেনি। দেশ বিভক্ত হওয়ার পর কাশ্মীর ও অন্যান্য ইশুতে হিন্দুস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘোর শত্রুতা হওয়া সত্ত্বেও করাচির গান্ধী গার্ডেনের নাম পাকিস্তান সরকার পালটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেনি। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর আমরা তাই করেছি।

—

www.pathagar.com

বিশিষ্ট দার্শনিক কবি ইকবাল সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। বাংলাদেশ হওয়ার পরপরই আমরা তাঁর নাম বদলিয়ে হলের নাম রাখলাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সার্জেন্ট জহুরুল হকের অবদান অসামান্য। তার হত্যাকাণ্ডই দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামর পূর্ব মুহূর্তে শুষ্ক বারুদ স্তূপে জলন্ত কাঠির ন্যায় বিস্ফোরণ ঘটাতে সাহায্য করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার দান অপরিসীম, কিন্তু তাই বলে এককালে পাক-ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের নিকট যিনি অতীব শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন সেই মহাকবি ইকবালের নাম পরিবর্তন করে সে হলের নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক রাখা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। সার্জেন্ট জহুরুল হককে সম্মান দেওয়ার জন্য তার নামে কোন নূতন হল করলেই চলতো বা নূতন কোন রাস্তার নামকরণ করলেই হত। এখানে স্মরণীয় যে ভারত সরকার ইকবালকে ভারতের অন্যতম জাতীয় কবি হিসাবে বহু আগেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পশ্চিম বঙ্গের বাম পন্থী সরকারও কয়েক বৎসর পূর্বে ইকবাল একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে এই মহান দার্শনিক কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে।

কারও অতীতের সুকর্ম বা অবদান অতি শীঘ্র ভুলে যেতে আমাদের সমকক্ষ বোধহয় এ দুনিয়ায় আর কেউ নেই। আর আজ যাকে মাথায় নিয়ে নাচি কাল তাকে পদদলিত করতেও আমাদের বাধে না। এভাবে নাম বদলাবার ফলে স্বভাবতঃই দেশের প্রবীন ব্যক্তিবৃন্দের ধারণা হ'লো আমাদের যুবকশ্রেণী ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা বিজাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যের ইঙ্গিতে আমাদের অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতে চাচ্ছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com